# রবীন্দ্রনাথ

আধুনিক বাংলা কাব্যের পাটাতনে যেসব নতুন ভাব/ভাবনা/আঙ্গিক/রূপকল্প বা চিত্রকল্পের সমারোহ, তার মূলেও 'শক্তির সংঘাত মাঝে বিশ্বে যিনি স্থির' সেই রবীন্দ্রনাথের অবদান অপমরিমেয়। প্রদীপ জ্বালার আগে একটা বিষয় থাকে ঃ তা হল সলতে পাকানো। এখানে বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়-দের আবির্ভাব এবং কাব্যপ্রাঙ্গণে তাঁদের পদচারণাও কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। এই বিষয়টি পর্যালোচনা করলেই বাংলা কাব্যের আধুনিকতার স্বরূপ ও আধুনিক কবিদের অনুপ্রেরণার মূল স্রোতটাকে আমরা অনুধাবন করতে পারব।

রবীন্দ্র-জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের ঘটনা বা পরিস্থিতির উদয় হয়েছে, তথাপি তাঁর মহান মানসিকতার আশ্চর্য সংহতি তাঁকে তিলে তিলে টেনে নিয়ে গেছে এক মহা দিগন্তে ঃ

*'সীমার মাঝে,অসীম, তুমি*
*বাজাও আপন সুর।*
*আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ*
*তাই এত মধুর।*
*কত বর্ণে কত গন্ধে,*
*কত গানে কত ছন্দে,*
*অরূপ, তোমার রূপের লীলায়*
*জাগে হৃদয়পুর।*
*　　*　　*
*তোমায় আমায় মিলন হলে*
*সকলি যায় খুলে —*
*বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে*
*উঠে তখন দুলে।*
*তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,*
*আমার মাঝে পায় সে কায়া,'*-র অনুভূতিতে।

এই অনুভূতির প্রকাশ শুরু হয় রবীন্দ্রজীবনের ঊনপঞ্চাশ বৎসরে। নববর্ষ উৎসবের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে তাঁর জীবনের ইচ্ছাকে প্রকাশিত করেছেন ঃ 'কাল এখানে নববর্ষ উৎসব। প্রার্থনা করি যে নববর্ষ কেবল পঞ্জিকার প্রথম পাতে দেখা না দিয়ে যেন জীবনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। আর কোনো সার্থকতা চাইনে। নূতন জীবন চাই। পুরাতনের যত ভয় লজ্জা দুঃখের জের যেন আর না টেনে আনতে হয় — একেবারে সব সাফ করে দিয়ে বড় রাস্তায় যেন বেরিয়ে পড়তে পারি। 'আর এক চিঠিতে মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন ঃ 'ঈশ্বর করুন এই বর্ষে যেন নূতন জীবনে জন্মলাভ করি—পুরাতন জীবনের সমস্ত জীর্ণতা দূর হয়ে যাক। পৃথিবীতে এতদিন যা কিছুকে নিজের বলে অহঙ্কার করেছি সমস্তই রিক্ত করে দিয়ে তাঁকে দিয়েই তিনি আমাকে পূর্ণ করে দিন'। এই সময়ে 'গোরা' উপন্যাস লেখা চলছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩১৬)। এই সন্ধিক্ষণে 'ছুটির পর' রবীন্দ্রনাথ একটি ভাষণ আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের দেন। যার মূল কথা হল, ঃ কর্ম থেকে মাঝে মাঝে অবকাশ নিলে কর্মের সঙ্গে যোগই নবীন হয়ে ওঠে। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ আত্মশক্তির গর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে দেখতে পেলে কর্মের চেয়ে বহুগুণে বড় জিনিসটিকে দেখা যায়। এই দৃষ্টি সবার থাকে না। যিনি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে ধরেন তিনি' মঙ্গলকর্মের মাঝে বিশ্বমঙ্গলকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন, আর এখানেই মঙ্গলকর্মের সার্থকতা। তাই এই দেখাও একটা সাধনা। যে স্থবির, যে অলস সে তো দৃষ্টিহীন। 'নিরুদ্যম যে তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন।' চিত্তের মধ্যে শূন্যতাবোধ সৃষ্টি হয়েছিল পর পর প্রিয়জনদের বিয়োগে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে বড় কাছাকাছি দেখেছিলেন। উত্তাল বাংলার রাজনীতি ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে এক অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করছিলেন। এই সময় থেকেই চিত্তের এই নিরুদ্যম প্রকাশের 'আবরণ' উন্মোচন করার সাধনায় রবীন্দ্রনাথ মগ্ন ছিলেন। [ রবিজীবনী (ষষ্ঠখণ্ড) প্রশান্ত পাল পৃ: ৭৮-৭৯ ]

১৯০৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অভিঘাত বেরিয়ে এল মুক্তির বাসনা নিয়ে —

*'অন্তর মম বিকশিত করো*
*অন্তরতর হে*
*নির্মল করো, উজ্জ্বল করো*
*সুন্দর কর হে*

*   *   *   *

*যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে*
*মুক্ত করো হে বন্ধ,*
*সঞ্চার করো সকল কর্মে*
*শান্ত তোমার ছন্দ।'*

এই গানটি রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালীন লেখা (২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)।

রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা, এই দিব্যচেতনা, এই অতীন্দ্রিয়-বোধের সঙ্গে আমাদের জীবনানুভূতির কোন



রবীন্দ্রনাথ—

ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। তার একটা কারণ হল, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ বা সাধনা কোন নির্দিষ্ট সাধনক্রমের অংশ নয়— এ হল সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত, একান্তভাবেই নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা প্রত্যক্ষ করতেন। তিনি আমাদের মধ্যে না জন্মালে বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে এত বৈচিত্র্য, অনুভূতির এত নিবিড়তা, ছন্দোপ্রবাহের এত উদ্দাম উচ্ছলতা, এত চিত্রকল্প ও রূপকল্পের সমারোহ দেখা যেত না। কবির সৃষ্টি-প্রেরণার স্বরূপ হল ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বিশ্বসত্তার সংযোগ সাধন। কবিজীবনে বিশ্ব-চেতনাবোধ যত গভীর হয়েছে, সৃষ্টি-প্রেরণাও তত বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানলোক বিশ্বপ্রাণের যোগে গড়ে উঠেছে। এই যোগ যত সম্পূর্ণ হয়েছে কবির সৌন্দর্যধ্যান ও প্রেমের ধ্যান ততই সমৃদ্ধিলাভ করেছে এবং উভয়ের সামঞ্জস্য তত গভীর হয়েছে। বিশ্বের সকল রূপ এবং ব্যক্তির বিচিত্র বোধের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই শুধু নয়, বিশ্ব ও ব্যক্তিকে আবার এক বৃহত্তর মিলনভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ব্যক্তি ও বিশ্ব শুধু নয়, এর সঙ্গে বিশ্বাতীত সকল লোক — আবার এ সব কিছুর ঊর্ধ্বতর কোন চেতনার দ্বারা বিধৃত। মানুষের এই অধ্যাত্মচেতনা এই মিলনতত্ত্বে পৌঁছে পূর্ণ পরিণাম লাভ করেছে। এই পরিণাম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, আলোচনার সুবিধার জন্য তার কিছু কিছু অংশ দেখা যাক ঃ

*'এই ভেদ ও সামঞ্জস্যের জন্যই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, আমরা এর কোনটাই ছাড়তে চাইনে। আমাদের যা কিছু প্রয়াস, যা কিছু সৃষ্টি, সে কেবল ভেদ ও অভেদে অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যই, দুঃখের মধ্যেই এককেই লাভ করবার জন্য।'* ১

*'ভেদ ও অভেদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ; মানবের জীবনভর সাধনা এক অখন্ড ঐক্য লাভ করতে চায়।'* ২

'প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখন্ডতার দ্বারা বিধৃত।

'স্বভাবের পূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম, আর যখন নানা কারণে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে তখন তার ধর্মনীতি সংযমে প্রবৃত্ত করায়।'

মানুষ একদিকে অনন্য একক সত্তা, অন্যদিকে সে সমগ্র মানবসমাজের বিশ্বের অন্তর্গত সমগ্রতার ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। জীবনের এই দুই দিকের ধর্মের কথা বলেছেন ঃ

*'সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়।'* ৩

*'সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।'* ৪

মানুষের সমস্যা হল শুধু এককে বা একককে লাভ করা নয়, বহুকেও নয়, মানুষ চায় এমন একটি তত্ত্ব যা

একযোগে এক এবং বহু, যে এক এবং অন্তহীন রূপে উদ্ভাসিত। এই বিশ্ব পৃথিবী এক অন্তহীন শক্তির পরিস্পন্দ। এই শক্তির স্পন্দন সমুদ্রে প্রতি মুহূর্তে সংখ্যাতীত রূপে বুদবুদের মত ভেসে উঠে আবার একাকার হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিচেতনার এই স্পন্দন সমুদ্রের বুকে এক একটি ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ মাত্র। জীবনসাধনার পশ্চাতে প্রত্যক্ষ করি এই শক্তিস্পন্দনের স্থির চেতনালোক । মানুষ এই স্পন্দনজগতের সীমাকে পেরিয়ে যেতে চায়। তাই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় দেহপ্রাণ-মনের সকল ধর্মের সঙ্গে অধ্যাত্মবোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রয়োজন। পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়ের পূর্ণ স্বীকৃতি আছে। এই উভয়কে নিয়েই অখন্ডতা বা পরিপূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। যার মধ্যে দেহ -মন- প্রাণ সকল ধর্মই সামঞ্জস্য লাভ করেছে। খন্ড খন্ড রূপের মাঝে অখন্ডতার প্রকাশ। অখন্ড বা অরূপ কোন রূপ-বিবর্জিত সত্তা নয়। তাই পূর্ণতার উপলব্ধিতে একদিকে সীমারূপ বা খন্ড আছে, আবার অন্যদিকে আছে এদেরই যোগে অসীম, অরূপ বা অখন্ড। তাই ‘ অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোন অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি’। [৫] অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ ‘মানুষের এক প্রান্তে বিশ্ব, অন্য প্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই নিয়ে তবে সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ।’ [৬]

মানুষের অন্তরে সেই প্রেম লুকিয়ে আছে যা সীমার মধ্যেই অসীমকে অবলোকন করতে পারে। এই প্রেমের শক্তিতেই মানুষ সব দুঃখকষ্ট, রোগ, শোক ও মৃত্যুকে হৃদয়ের গহীনে বহন করতে পারে এবং এই প্রেমের বলে সে সব কিছুকে জয় করে আনন্দস্বরূপে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ ‘ প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণ শক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে, রূপের মধ্যে অরূপকে দেখতে পায়, তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়েছিল।’ [৭]

‘বিশ্ব তার আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছিনে, সেইজন্য রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে , আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি। সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।’ [৮] রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের পিছনে সামঞ্জস্যতত্ত্বের দৃঢ় উপলব্ধি ছিল। ‘রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সামগ্রিম। উহা দেহ ও মন, জড় ও চৈতন্য, ব্যক্তি ও সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতি, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে একান্ত বিচ্ছেদ স্বীকার করে না।’

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের পরিপূর্ণ নিটোলতা উপভোগের সীমায় ধরতে গেলে বুঝতে হবে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূলে কবিমানসের এক সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতি। এই ঐক্যানুভূতির গহীনে রয়েছে সৃষ্টির সমস্ত খন্ড খন্ড ভাব-ভাবনা। জিনিসের তুচ্ছাতিতুচ্ছ-কেও তিনি এক অখন্ডতার সঙ্গে যুক্ত করে সার্থকতা দান করেছেন। জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কাহিনীও কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কবি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে একটা সেতু নির্মাণ করে অখন্ডতা, পরিপূর্ণতা দান করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টি, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবন, বিশ্বদেবতার সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা বলে উপলব্ধি করেছেন।



রবীন্দ্রনাথ--

তাই সীমা-অসীম, রূপ ও অরূপ, দেশকাল ও দেশকালাতীত, স্থির ও গতির যৌথ ধারাকে কেন্দ্র করেই মানব জীবনদর্শন গড়ে উঠেছে ঃ

*'Ideals fashion themselves round there two notions, permanence and flux, In the inescapable flux, there is something that abides; in the overwhelming permanence, there is an element that escapes into flux. Permanence can be snatched only out of flux, and the passing moment can find its adequate intensity only by its submission to permanence. Those who would disjoin the two elements can find no interpretetion of patent facts.'* [৯]

শিশুকাল থেকে তাঁর এই পদযাত্রা। এর মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী, বেদ-উপনিষদ-পুরাণ, আউল-বাউল, মায় বৌদ্ধ-সংস্কৃতি প্রভৃতির ধ্যান- ধারণাকে কবি তিলে তিলে পড়েছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন, তারপর স্বীকরণ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা গৃহী তপস্বী, মহাযোগী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন পিতার সাধনার তথা ঔপনিষদিক চেতনার উত্তরাধিকার।

উপনয়নের পরে কবি খুব মন দিয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন। 'এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'তো বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক।' [১০]

বিশ্ব-চৈতন্যের সঙ্গে কবি-চৈতন্যের একাত্মতার উদাহরণ ঃ

*'আমার পৃথিবী তুমি*
*বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে*
*আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে*
*অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ*
*সবিতৃমন্ডল; অসংখ্য রজনী দিন*
*যুগ যুগান্তর ধরি আমার মাঝারে*
*উঠিয়াছে তৃণ তব পুষ্প ভারে ভারে*
*ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি*
*পত্র ফল ফুলগন্ধ রেণু। তাই আজি*
*কোন দিন* আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে,
.............................................
*আকাশের নীলিমায়'* [১১]

সমকালের লেখা 'ছিন্নপত্রের' ছত্রে ছত্রে ফুটে আছেঃ 'এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত,-আমি কত দূর-দূরান্তর দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, যখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকান্ডভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত সূর্যস্নাত আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে — সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।' [১২]

প্রকৃতির একাত্মতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয় 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। রবীন্দ্র কাব্যপ্রতিভা স্ফূরণের পূর্বেই এই অখন্ড বিশ্বচৈতন্যবোধ কবির মনে জেগে উঠেছিল ঃ

*'প্রাণের সমুদ্র এক আছে যে এ দেহ মাঝারে*
*মহাউচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে;*
*মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখানা করি বিদারিত*
*সমস্ত জগৎ চাহে সখী করিতে প্লাবিত।'* [১৩]

রবীন্দ্র আত্মদর্শনের প্রতিধ্বনি ঃ

*'আকাশে পৃথিবীতে*
*এ জন্মের ভ্রমণ হলো সারা*
*পথে বিপথে।*
*আজ এসে দাঁড়ালেম*
*প্রথম জাত অমৃতের সম্মুখে'* [১৪]

কবি অনুভব করেছেন, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ড আর কবিচেতনা মিলেমিশে একাকার। বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুরূপে যে পরমাত্মা, সেই অখন্ড সত্তা যে কবিরই সত্তা।

রবীন্দ্র কাব্যসম্ভারের প্রতিটি পর্বে কবি যেন মানসভ্রমণ করেছেন। 'খেয়া'- পর্ব রবীন্দ্রজীবনে গম্ভীর পর্যায়। 'নৈবেদ্য' প্রকাশ (অর্থাৎ ১৯০২) থেকে ১৯১৪-তে 'বলাকা' -পর্বের সময় পর্যন্ত কবি-প্রতিভার যেন বনবাস-পর্ব চলেছিল। কারণ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে, ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়লেন। 'কবি-হিসাবে যাহা কাব্যে প্রকাশ করা স্বাভাবিক ছিল, কর্মী-হিসাবে তাহাকে কার্যে রূপ দিতে চেষ্টা করিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন এই আন্দোলনের সূত্র ধরে যদি ভারতের সর্বাঙ্গীন মহত্ত্বকে তুলে ধরা যায়। সেটা শেষ পর্যন্ত সম্ভব না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের নির্জনতায় ফিরে আসেন। ১৯০২ সালে কবি-পত্নীর মৃত্যু, তারপর প্রথমা কন্যার এবং তার তিন বছরের মধ্যেই পুত্রের মৃত্যুশোকে রবীন্দ্রনাথও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই সব ঝোড়ো প্রভাব কাটিয়ে কবি অধ্যাত্ম-জীবনের গহীনে প্রবেশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্ব যা বিশেষত্ব হল, তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের বহুমুখীনতা। যখন যা লিখেছেন তা নব নব রূপে চমক এনেছে, ভাবিয়েছে। যে কোন বিষয়ের প্রকরণে- ভাষায় তিনি নবত্ব আনতে পেরেছেন। অতীন্দ্রিয় বা অধ্যাত্ম-চেতনার সর্বোচ্চ শিখরে কবি পৌছেছেন 'গীতাঞ্জলি -গীতিমাল্য-গীতালি' পর্বে। সেইজন্য এর পূর্বের 'খেয়া'- পর্ব রবীন্দ্র জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। 'গীতাঞ্জলি'- পর্বের প্রেরণার মূলে ভগবৎভক্তি। এই পর্ব থেকে গান হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাবের বাহন। কারণ হিসেবে সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন ঃ 'জীবনের পরিণতির সঙ্গে কবি এমন একটা ছায়া-শরীরী জগৎকে প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন, যাহা কেবল সঙ্গীতের দ্বারাই কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব। কবির জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ভাবের বাহন কবিতা, কারণ সে জগৎটা সূক্ষ্ম-শরীরী হইলেও একেবারে ছায়া-শরীরী নহে। কিন্তু পঞ্চাশের কাছে আসিয়া কবির জগৎ ছায়া-শরীরী হইয়া উঠিয়াছে।' [ রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ - প্রমথনাথ বিশী ]

এই পর্বে পৌছে কবি অসীম বা অরূপকে অব্যবহিতরূপে স্থায়িভাবে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। রূপ এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে শরীরী বাণীরূপে। তাই কবি সকল রূপের অতীতে সেই অখন্ড -অরূপকে সকল আঁধার -মুক্ত করে লাভ করতে চান। এতদিন তিনি রূপ থেকে রূপে বিশ্বময় বিহার করে ফিরেছেন। এই সন্ধিক্ষণে কবি সকল রূপকে অনুবিদ্ধ করে সকল রূপের অতীত সত্তাকে লাভ করবার জন্য উন্মুখ ঃ

*'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি*
*অরূপ রতন আশা করি;*
*ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর*
*ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।*
*সময় যেন হয় রে এবার —*
*ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,—*
*সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে*
*অমর হয়ে রব মরি।*
*যে গান কানে যায় না শোনা*
*সে গান যেথায় নিত্য বাজে,*
*প্রাণের বীণা নিয়ে যাব*
*সেই অতলের সভামাঝে।*
*চিরদিনের সুরটি বেঁধে*
*শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,*

*নীরব যিনি তাঁহার পায়ে*
*নীরব বীণা দিব ধরি'*

রূপের মাঝে কবির অরূপের অন্বেষণ। কবির আকুতি ঝরে পড়েছে —

*'ছিন্ন করে লও হে মোরে*
*আর বিলম্ব নয়*
*ধুলায় পাছে ঝরে পড়ি*
*এই মোর জাগে ভয়।'*

সীমার বোধকে অন্তর্জগতে গ্রহণ করে কবি আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় উদ্বেল। ভগবৎ-প্রেমে কবিসত্তার মর্মান্তিক আকুতি ঃ

*'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার*
*চরণ ধুলার তলে।'*
*সকল অহঙ্কার হে আমার*
*ডুবাও চোখের জলে।*

কিংবা,

*'আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।*
*তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধুসর হব।*
*কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ*
*চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো,*
*অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।*
*তোমার চরণধুলায় ধুলায় ধুসর হব।'*

নিজের জীবনে সীমা-অসীমের দ্বৈত লীলা সম্পর্কে কবি ছিলেন পূর্ণ সচেতন। কবির সসীম অন্তরাত্মা অনন্ত অখন্ড অসীম পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। মধুরতম অসীমের স্পর্শে কবি-জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে। আনন্দময় অনাদি অনন্ত ঈশ্বর কবির অন্তরে নেমে আসেন ঃ

*'তাই তোমার আনন্দ আমার পর*
*তুমি তাই এসেছ নীচে —*
*আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর*
*তোমার প্রেম হত যে মিছে।*

*আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,*
*আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,*
*মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে*
*তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।'*

'অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি, অসীম যেখানে সীমাহীনতায় যেখানে গান' [১৫] —'রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার নির্ব্যক্তিক প্রকাশ কবিতায়, সব্যক্তিক প্রকাশ গানে। — (১৩১৪ সালের মাঝামাঝি) কনিষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে কবিধর্ম কিছুদিনের মতো যেন বিচলিত হইল। তখন শোকবেদনার উৎসার হইল এক অভিনব ভক্তিরসে। তাহার মুখ্য প্রকাশ 'গীতাঞ্জলি' তে (১৩১৭)।'

সীমা-অসীমের মিলনতত্ত্ব ভারতীয় ঋষির সত্যদর্শনেরই প্রভাব-সঞ্জাত। *'According to Hegel, there is only one real fact in the universe — namely, the absolute and anything which is less than the absolute is not entirely and completely a fact .........It is only in the absolute that all the partial ideas are embraced and made to where, and only of the absolute, therefore, the complete truth may be predicated.'* [১৭]

রবীন্দ্রনাথের একত্ব-ধারণা আর হেগেলের পূর্ণতার ধারণার মধ্যে অনেকাংশে মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তনশীলতায় গভীর বিশ্বাসী হয়েও পূর্ণত্বে আস্থাশীল ছিলেন।

সীমা-অসীমের মিলনে অখন্ড পূর্ণতার ধারণা রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কার থেকেই পেয়েছিলেন। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সীমা-অসীমের একত্বেরই তত্ত্ব। শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে এ জ্ঞান লাভ করেছেন। পরমেশ্বর পরম ব্রহ্ম বিরাট, উদার, মহান, অনন্ত, অসীম — আকাশের মতোই সীমাহীন। তিনি ভূমা। 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।' অল্পে সুখ নেই, ভূমাতে সুখ — অতএব ভূমাকে জানতে হবে। সেই ভূমাই তো সীমার মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়েছেন নিজেকে বহুধাবিভক্ত করে। সর্বভূতের অন্তরাত্মা হয়ে অণুতে-পরমাণুতে, স্থাবরে-জঙ্গমে তিনি বিরাজমান। 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' — তিনি যেমন বিরাটতম, তেমনি অণুপরিমিতও।

'অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াম্ ' [১৮]

ব্রহ্ম যেমন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ -বৃহত্তর, মহত্তর - মহত্তম— অন্যদিকে তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র,অণু-অণুতম-দ্ব্যণুক-ত্র্যণুক, তার থেকেও ক্ষুদ্র। তিনি অবাঙ্মনসোগোচর ঃ — ধারণার অতীত। তিনি বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে বিরাজমান। তিনি সীমা, তিনিই সীমাতীত। তিনি স্বরাট, তিনি স্বয়ং পূর্ণ। সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধি লাভেই মানবজীবনের চরিতার্থতা ঃ

*'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,*
*ফিরো না তবে ফিরো না, করো*
*করুণ আঁখিপাত।'*

কিংবা,

*'কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে*
*বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে।*
*অস্তরবির শেষ আলোটির মতো*
*তরী নিশীথ মাঝে যাবে নিরুদ্দেশ'*

কিংবা,

*'এ দয়া যে পেয়েছে তার*
*লোভের সীমা নাই ——*
*সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে*
*তোমায় দিতে ঠাঁই '*

কিংবা,

*'তব সিংহাসনের আসন হতে*
*এলে তুমি নেমে,*
*মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে*
*দাঁড়ালে নাথ থেমে'*

কিংবা,

*'পুষ্প দিয়ে মার যারে*
*চিনল না সে মরণকে।*
*বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে*
*ধরে তোমার চরণকে'*

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমুদেয় কাব্য-সাহিত্য-প্রবন্ধে তাঁর অধ্যাত্মস্পন্দিত ভাবনা 'কণায় কণায় বেঁটে' দিয়েছেন এবং——

*'কতবার যে নিবল বাতি*
*গর্জে এল ঝড়ের রাতি,*
*সংসারের এই দোলায় দিলে*
*সংশয়েরি ঠেলা।*

*বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া*
*বন্যা ছুটেছে।*
*দারুণ দিনে দিকে দিকে*
*কান্না উঠেছে।'*

কবি, 'রসের রসাতলে /গভীর রসের রসাতলে' নিমজ্জিত হতে পেরেছেন, ভূমার স্বরূপকে অনুধাবন করতে পেরেছেন। সমস্ত শোক- সংঘাতকে এড়িয়ে আশ্চর্য সহনশীলতায় রবীন্দ্রনাথ জীবনদর্শনের ভারতবর্ষীয় স্বরূপ জগৎসভায় তুলে ধরেছেন ঃ

*'আমার সকল রসের ধারা*
*তোমাতে আজ হোক না হারা*
*জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,*
*ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,*
*তোমার রূপে মরুক ডুবে*
*আমার দুটি আঁখি তারা।'*

এতদিন রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতকে অবলোকন করেছিলেন সীমার দিক থেকে। এখানে তাঁর প্রেরণার উৎস ছিল আমিত্ববোধ। রূপলোকের সুষমাকে কবি সঙ্গীতরূপে উপলব্ধি করেছেন। সৃষ্টির অনন্ত রূপবৈচিত্র্যও যেন একটা সুরের রেশ। এই রেশ ধরে কবি নিত্যকাল অখন্ড সঙ্গীত রচনা করে চলেছেন। তাই তো কবির ভাবনার স্ফুরণে বিচ্ছুরিত হয়েছে ঃ

*'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে*
*মোর প্রাণে*
*এ আগুন ছড়িয়ে গেল*
*সবখানে।'*

রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভ ও মুক্তিসাধনার পথিক ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে-গানে জগতের অনিবার্য স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হয় ঃ

*'এমনি করে চলতে পথে ভবের কূলে*
*দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব নিস রে তুলে।*
*সেগুলি তোর চেতনাতে*
*গেঁথে তুলিস দিবস রাতে।'*

রবীন্দ্র-সাধনা কোন অবস্থাতেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করেনি, কারণ পূর্ণতা লাভ করলে এই লীলারসটিকে সম্ভোগ করা যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, পূর্ণ মিলনের আনন্দ নয়, লীলারস আস্বাদন করতেই কবি আগ্রহী ঃ

*'আপনাকে এই জানা আমার*
*ফুরাবে না*
*এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে*
*তোমায় চেনা।'*

কিংবা,

*'এমন করে মোর জীবনে*
*অসীম ব্যাকুলতা,*
*নিত্য নূতন সাধনাতে*
*নিত্য নূতন ব্যথা।'*

কিংবা,

*'তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর*
*যবে আমার জনম হবে ভোর —'*

তাই পথ চলাতেই কবির আনন্দ। পথে চলতে চলতে মানব-অন্তরের মাঝে অরূপের অভিব্যক্তি নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

*'পথের শেষে মিলবে বাসা*
*সে কভু নয় আমার আশা*
*যা পাব তা পথেই পাব —'*

কিংবা,

*'যত আশা পথের আশা,*
*পথে যেতেই ভালবাসা,*
*পথে চলার নিত্যরসে*
*দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।'*

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন মানবমুক্তির জীবনদর্শন। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মানবকেন্দ্রিক ভাবনায় জারিত। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সৃষ্টিকে বৈদান্তিক মায়াবাদী বা বৈজ্ঞানিক জড়বাদীর চোখে দেখেন নি, এই পৃথিবীকে পরিপূর্ণরূপে কবি ভালবেসেছেন। তাই তাঁর কাব্যে-গানে মর্ত্যই স্বর্গরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যে মানুষের



*রবীন্দ্রনাথ—*

প্রতি নিবিড় অনুরাগ, গভীর ভালবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনকে সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে তুলে বিশ্বজনীন করে তোলাই ছিল তাঁর ধর্ম, তাঁর দর্শন। মর্ত্য ও মানবপ্রীতির মধ্য দিয়ে তিনি অসীম, অরূপ ও পরমানন্দের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসম্ভারের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এক চৈতন্যময় বিশ্ববোধের ধারণা। উপনিষদের ঋষিদের মত রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ছিল মহাচৈতন্য অধ্যাত্মস্বরূপকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করা -- আপনাকে ব্যাপ্ত-চৈতন্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার তপস্যা করা। 'এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল, এই কথাটি যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে উঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ।' [১৯]

'গোরা' উপন্যাসে গোরার মুখেই প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথের সর্ব সংস্কারমুক্ত ধর্মের পরিচয় ঃ ' আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান-ব্রাহ্ম সকলেরই — যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোন দিন অবরুদ্ধ হয় না — যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।' [২০]

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বা তাঁর অধ্যাত্মচেতনা বা অতীন্দ্রিয় মননের প্রকাশ ভারতীয় ঋষিদের ধ্যানলব্ধ সীমা-অসীমের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। 'সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোন সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা। কিন্তু মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও, সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হইবে।' এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অমৃত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য, সেই সীমার মধ্যেই আমাদের পরম পরিপূর্ণতা। — আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ সীমা ও অসীমের পক্ষে যতখানি, অসীম ও সীমার পক্ষে ততখানি, উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।' [২১]

তাই 'বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন — ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।' [২২]

'রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বঙ্গসাহিত্যে আনিয়া দেন, এবং যাহাদের অনুশীলনে কেহই এ পর্যন্ত তাঁদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, তাহার ইংরেজি নাম *refined delicacy*............... বা সাহিত্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের কবিশেখর।' [২৩] ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ তিল তিল করে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে শিখেছিলেন। তাছাড়া তাঁর চতুর্দিকে পরিবেশ ও আবহাওয়া এবং স্বয়ং মহর্ষির প্রভাবে পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় অধ্যাত্মচেতনার দ্যুতি প্রকাশিত হয়েছিল। ' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বহু বিচিত্র প্রতিভার সমারোহ সংযত হয়েছিল, তা তিনি পেয়েছিলেন উত্তুঙ্গ হিমালয়ের নিস্তব্ধ নির্জন ধ্যানের আসনে সমাহিত একজন উগ্রতপা, একমনা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মহর্ষির কাছ থেকে। যদিচ রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তাঁর পিতৃদেবের পরম স্নেহভাজন শিষ্যরূপে কল্পনা

করতে গৌরব বোধ করতেন, এক মন্দিরের বেদী থেকে কিংবা বক্তৃতামঞ্চকে বেদীস্থানে গুরুদেবের পরিচ্ছদ ধারণ করে ধর্মোপদেশ দেবার বেলা ছাড়া, তাঁর সঙ্গে মহর্ষির কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। কেবল সাহিত্য রচয়িতারূপে তিনি যে বহুবিচিত্র মানসের অধিকারী ছিলেন এমন তো নয়। বাইরে থেকে তাঁর প্রেম ছিল যেমন গভীর তেমনি দীপ্যমান। এই পৃথিবীর মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে শান্ত চোখে তিনি সব কিছু নিরীক্ষণ করতে পারতেন। কিন্তু কখনো কখনো বার্নার্ড শ'-র মতো তাঁর চোখে একটা কৌতুকের ঝিলিক খেলত চারিদিকের সমস্ত ব্যাপার দেখে। যে 'গীতাঞ্জলি'-র ধর্মসাহিত্যের জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেই গীতাঞ্জলি-র গান রচনাকালেও তাঁর হাস্যকৌতুকের বিরাম ছিল না। — তাঁর মতামতে একটা প্রশস্ত উদারতা দেখা দিয়েছিল, মতের বিরোধকে তিনি যেন বেশি করে মেনে নিতে শিখেছিলেন, অচেনা অজানার প্রতি তাঁর ভয় বা সংশয় অনেকটা যেন কেটে গিয়েছিল, খামখেয়ালীপনাও তিনি যেন খুশী হয়ে বরদাস্ত করতে পেরেছিলেন, বিশ্বজনীন দৃষ্টি নিয়ে তিনি যেন জাতিবর্ণধর্মানির্বিশেষে সকল মানুষকে এক মনুষ্যজাতির অন্তর্গত বলে দেখতে শিখেছিলেন।' [২৪]

রবীন্দ্রনাথের একটা বড় গুণ ছিল যে হাজারো কর্মে ব্যাপৃত থাকলেও, বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেও এবং নানা বিরোধ-বিক্ষোভের মধ্যে পড়েও তিনি অবিচল সহিষ্ণু ও সংযত ভাবে মনটাকে মুড়ে রাখতেন। তাঁর অধ্যাত্ম-স্পন্দিত মনোভাবের উপর অধুনা বাংলাদেশের সাহাজাদপুর ও শিলাইদহের প্রভাব ছিল, কারণ গ্রাম বাংলায় মোহময়ী প্রকৃতির তিনি প্রশান্ত রূপ অবলোকন করেছিলেন, তেমনই তার অশান্ত-চঞ্চল রূপও প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সহজিয়া-বৈষ্ণব-বাউল-দরবেশদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা ছোটবেলা থেকেই ছিল। কৈশোরে 'বাউলের গান' প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ ১২৯০) প্রকাশ পেয়েছিল। 'সাধনা' পত্রিকার সময়েও রবীন্দ্রনাথের উত্তর-মধ্য বঙ্গের আন্দী বোষ্টমীর সঙ্গে সখ্যতা ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্যরস এবং বৈষ্ণব ধর্মের মানবিক আবেদন রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। 'গীতাঞ্জলির ঈশ্বরাকুতিও তেমনি বড়ো 'আমি'র সঙ্গে মিলিয়ে ছোটো 'আমি'কে চেনার আকাঙ্ক্ষা। ' [২৫]

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের এই দিব্যচেতনা বা অধ্যাত্মবোধ নির্দিষ্ট কোন সাধন-ভজনের এক্তিয়ারে পড়ে না। এই বোধ, এই ভাবনা সম্পূর্ণ স্বকীয়, সম্পূর্ণ কবির ব্যক্তিগত। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'তপোবন' নামক প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তার একটা *turning point*। এরপর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তরে পৌঁছে গেয়ে উঠলেন ঃ

*'আলোয় আলোকময় করে হে*
*এলে আলোর আলো,*
*আমার নয়ন হতে আঁধার*
*মিলালো মিলালো।*
*সকল আকাশ সকল ধরা*
*আনন্দে হাসিতে ভরা*
*যেদিক পানে নয়ন মেলি*

*ভালো সবাই ভালো।*
*তোমার আলো গাছের পাতায়*
*নাচিয়ে তোলে প্রাণ*
*তোমার আলো পাখির বাসায়*
*জাগিয়ে তোলে গান।*
*তোমার আলো ভালোবেসে*
*পড়েছে মোর গায়ে এসে,*
*হৃদয়ে মোর নির্মল হাত*
*বুলালো বুলালো।'*

এরপর রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রম','ভক্ত' ও 'বিশ্ববোধ' লেখেন। এর অন্তরের নির্যাসই হচ্ছে বিশ্বজাগতিকতা বা বিশ্বাত্মবোধ *(internationalism)*।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পৃথিবীতে রবীন্দ্র-খ্যাতির পরিচালক হল কবি ইয়েটস-এর ভূমিকা-সম্বলিত ইংরাজি 'গীতাঞ্জলি' কিংবা আদ্রেঁ জিদ কর্তৃক 'গীতাঞ্জলি'-র ফরাসী অনুবাদ। এর পরিপূরক ছিল *Religion of Man* এবং *Nationalism* প্রবন্ধ বইদুটি। গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের আনুষ্ঠানিক ভেদাভেদের উর্ধ্বে শাশ্বত সর্বমানবিক ঐক্যের সুর শুনিয়েছেন। ফলে প্রতীচ্যের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদী কবিরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপের মাটি ও মনে এসেছিল যে ভাঙন, অপহৃত হয়েছিল যে মানবসম্পর্কের, যে নৈরাশ্য তিক্ততা ও মূল্যাতিয় গ্রাস করেছিল মানুষকে, তাতে প্রাচ্য থেকে সম্প্রসারিত এই ঐক্য, মৈত্রী ও আত্মনিবেদনের বাণী তাঁদের স্বাভাবিকভাবেই খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ গৃহীত হয়েছিলেন মহান মরমী কবি ও মানবমৈত্রীর অগ্রপুরোহিত এক ভাববাদী চিন্তানায়ক রূপে। — তারপর প্রথম যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাজনীতিক আকাশে যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মেঘ জড়ো হতে লাগল, তার সাংস্কৃতিক জগতেও তেমনি জমতে লাগল নতুন যুগচেতনা, যা ভাববাদী শিল্পভাবনার বাতাবরণ সম্পূর্ণ পালটেছিল। অবহেলিত নীচু তলার মানুষরা মাথা তুলে দাঁড়ালেন ন্যায্য জীবনাধিকারের দাবীতে। অবদমিত কামনাবাসনাগুলো হাত-পা মেলে বাইরে বেরিয়ে এল শিল্পীর সুবিচার চেয়ে। ঈশ্বর, অদৃষ্ট ও মোক্ষের প্রত্যয় পরিহার করে প্রতীচ্য দাঁড়াল বিজ্ঞানের মেরুদন্ডে ভর করে।'

সত্যি কথা বলতে গেলে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই উপনিষদ, বেদান্ত, বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র এবং মধ্যযুগীয় সাধকদের রচনা ও মৈত্রী-প্রীতি এবং ঐক্যের সুর ভারতীয় সংস্কৃতির নামে প্রচারিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথও এই স্রোতের মাঝে পড়েছেন। প্রতীচ্যের চোখে রবীন্দ্রনাথের এই রূপটিই বিশেষ করে প্রতিভাত হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি এই ছকের মধ্যে পড়েন? তাঁকে কি কোন গন্ডিতে বাঁধা যায়? তিনি সব কিছুতেই আপন মহিমার, আপন স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন —যার স্পর্শে তাঁর পরিপূর্ণতার স্বরূপ হীরের দ্যুতির মত ঠিকরে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক এবং এক নজিরবিহীন প্রতিভা, যাঁর পরিচিতি আজও বাঙালীর বলনে-মননে-চলনে ভাস্বরিত।

'গীতাঞ্জলি'র মূল গানগুলি কবি লিখেছিলেন তাঁর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ে। কবি-জীবনের সূচনায় তিনি যখন ছিলেন বাংলার কবি এবং বাংলার আকাশ-বাতাস-জল, বাংলার পালাপর্ব-উৎসব-আনন্দ, বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনা যখন তাঁর গল্পে -কবিতায়-গানে মূর্তি ধরছে, সেই সময় দেশে শুরু হল স্বদেশী আন্দোলন এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন তিনিও। কিন্তু সেই গন্ডি কাটিয়ে কি কারণে বাইরে চলে আসতে হল তাঁকে, সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর হলেও এটুকু বলে রাখা যেতে পারে যে, তার বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে দেরি হল না তাঁর। মন দ্রুত ব্যাপ্ত হল বৃহৎ ভারতবর্ষের আকাশ। উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত এবং কালিদাসের ভারতবর্ষ, বৌদ্ধ-বৈষ্ণব -বাউলের ভারতবর্ষ অধিকার করল তাঁর মন। এখন থেকে রবীন্দ্র-কণ্ঠে ধ্বনিত হল অধ্যাত্মস্পন্দিত সুর — 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য ও গীতালি'-র পদযাত্রা, যার ভৌগোলিক সীমা বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথের আত্মগত অনুভূতির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে এই পর্ব থেকে। অনেক সমালোচক এই পর্বে দাদু- কবীর-বজ্জবালি-রামানুজ-নিম্বার্ক দর্শনের ভক্তিবাদের ছবি লক্ষ্য করেছেন। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ এই পর্বে রোমান ক্যাথলিক ভাবের অনুরণন লক্ষ্য করেছেন। মোট কথা, এই সময়ে আত্মগত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্রকাব্যচর্যার অঙ্গনে দৃশ্য হয়েছে। ভাষান্তরে সীমার মাঝে অসীমের মিলন সাধনের পালা সংঘটিত বা রূপায়িত হয়েছে।

বাস্তব জীবনের মোহ কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসীমের নৌকায় উঠে বসলেন। কবি গেলেন অতীত ভারতের তপোবনের যুগে—কালিদাসের কালে। দেখলেন প্রাচীন ভারতকে। উর্বশী-বিজয়িনীর স্বপ্নে যখন চোখ বুঁদ হয়ে এল তখন হঠাৎ খেয়াল হল, এসবই আদর্শ, স্বপ্ন— বাস্তব নয়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভূতলের স্বর্গখন্ডগুলির কথা, সঙ্গে সঙ্গে সীমার জন্য ব্যাকুলতা। 'এবার ফিরাও মোরে।' কবি ফিরে এলেন মর্ত্যভূমিতে, সেই পরিচিত লোকালয়ে। কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হল নিজেকে। 'খেয়া'-তে তারই প্রতিধ্বনি। সীমাকে ছেড়ে একদা তিনি অসীমের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, আশ্রয় মিলেছিল। কিন্তু সেখানে পায়ের নিচে মাটি নেই। কাজেই মাটিতে ফিরে আসতে হল।

কবি অনুধাবন করলেন সীমাকে বাদ দিয়ে অসীমের অন্বেষণ কত মিথ্যে, কত অলীক। তাই তো 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' সকল দ্বন্দ্ব, সকল সংশয় নিরসন করল। 'জগৎ দেখিতে হইব বাহির' -এর একটা পালা সাঙ্গ হল। 'গীতাঞ্জলি'র পরিসর জুড়ে প্রশান্তির মলয় — শান্তির শামিয়ানা খাটানো। সব ব্যাকুলতার অবস্থান। দিনযাপনের ,প্রাণধারণের সব গ্লানি বিদূরিত হল একটি নমস্কারে। অপার আনন্দসাগরে পাল তুলে দিয়ে বিহার করতে লাগল কবির মন। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব- সংশয় কাটিয়ে আত্মগত এক মহান আনন্দঘন উপলব্ধিতে সমাসীন হলেন কবি। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যসম্ভারের কোষে কোষে; রোমকূপে রোমকূপে এই আনন্দবোধের আন্দোলন। দুঃখ নয়, হতাশা নয়, মৃত্যু নয়, আমরা সবাই ' অমৃতস্য পুত্রাঃ' — এই হচ্ছে রবীন্দ্রবোধ। এই হচ্ছে রবীন্দ্রবাণী, রবীন্দ্র সংস্কৃতি, রবীন্দ্র ঐতিহ্য। এই হচ্ছে রবীন্দ্রযুগ যার অন্তরে ভাস্বরিত কবির বিশ্বাস, আর আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জাগ্রত রয়েছে এই চেতনা। এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পরিক্রমা শুরু।' বলাকা'র বাতায়ন থেকে শেষ পর্যন্ত কবি বিশ্ব মানবসমাজের দূত হিসেবে পদচারণা শুরু করলেন।

এতদিন ধরে রবীন্দ্রনাথ তিল তিল করে যে বোধকে বিশ্বাস করেছেন, যে চেতনার আলোকে আলোকিত ছিলেন, যে সত্যবোধে অবিচল ছিলেন তা হল ঃ 'সে সত্য প্রধানত কবিতা বৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়;



*রবীন্দ্রনাথ—*

সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা.... ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। 'এই সত্যই একদিন সর্বজগৎ সর্বধর্মকে ঐক্যসূত্রে বাঁধবে — 'দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে।'

এরপর (২৬শে বৈশাখ ,১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ কিছু কালের জন্য শিলাইদহে আসেন। লিখিত হয় 'অচলায়তন' নাটক। এর পর ভাদ্র মাস থেকে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে — তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।' [২৬] এর আগের বছর 'রাজা' নাটক প্রকাশিত হয়। 'গীতাঞ্জলি'- পর্বে কবিচিত্তের অন্দরমহলে বহু ভাব-ভাবনা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়নি — তারই রহস্যলোকের অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার রেশের অন্যতম প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে। নাট্যসাহিত্যে 'রাজা' এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিল। বাইরের উৎসবকে কেন্দ্র করে নাটকটা শুরু হলেও শেষ হয়েছে গহীন গভীরের মধ্যে। বাইরের জগৎ থেকে অন্তর-জগতের মাঝে প্রবেশের অভিযান রূপকের মাধ্যমে নাট্যায়িত -- যেখানে 'বাহির হইতে অন্তরের প্রয়াণপথে যে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম তাহাই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।' শেষ পর্যায়ে 'রাণীর প্রেমদৃষ্টি এখন রাজার রূপকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, তাই রাজা তাহাকে বাহিরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'এসো এবার আমার সঙ্গে এসো,বাইরে চলে এসো — আলোয়।' [২৭]

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুদূরের পিয়াসী। বিশ্বময় পাড়ি দিয়েছেন, নানান মানুষ ও সমাজে মিশেছেন। নানা জীবনচর্যার খোঁজ রেখেছিলেন। নব নব সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে কবি এগিয়ে চলেছেন আপন স্বকীয়তা নিয়ে। বাংলা সাহিত্যের দিগন্তের উষার আলোর ফাগে প্রস্ফুটিত রক্তিম শতদল নব নব রূপে, থরে থরে ফুটিয়ে চলেছেন কবি। 'আত্মপরিচয়' -এ তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন ঃ '- যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি,—'

*'গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা*
*প্রতিদিন আমি করেছি রচনা*
*তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া*
*সুরভিনিত্য নব।'*

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি'। নব নব প্রকাশে দীপ্যমান কবির ভাবনা ঃ

*' ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,*
*আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,*
*নূতন করিয়া লহো আর বার*
*চিরপুরাতন মোরে—*
*নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়*

*নবীন জীবন ডোরে।'*

' নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আর্বিভাবকে অনুভব করা গেছে —যে আর্বিভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল- মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন,— নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি ; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তবেরর মধ্যে আনন্দ গানে বহিয়া গেছে। তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি ঃ

*'হই যদি মাটি, হই যদি জল*
*হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,*
*জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল*
*কিছুতেই নাই ভাবনা,*
*যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে*
*অন্তবিহীন আপনা।'*

'তখনি এ কথা বলিয়াছি —

*'আমারে ফিরায়ে লহো,অয়ি বসুন্ধরে,*
*কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে*
*বিপুল অঞ্চলতলে, ওগো মা মৃন্ময়ী,*
*তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,*
*দিগ্বিদিকে আপনাকে দিই বিস্তারিয়া*
*বসন্তের আনন্দের মতো।*

'এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই —

*'তোমার মৃত্তিকা সনে*
*আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে*
*অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ*
*সবিতৃমন্ডল, অসংখ্য রজনীদিন*
*যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে*
*উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে*
*ফুটিয়াছে ,বর্ষণ করেছে তরুরাজি*

*পত্র ফুলফল গন্ধরেণু।*

'আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই — বিশ্বের সাহিত আমি আমার কোন বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

*'মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর*
*চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে;*
*ভালবাসিয়াছি আমি — ধূলিমাটি তোর।'*

এরপর কবি *Mystic* বা অতীন্দ্রিয় বা অধ্যাত্মচেতনার গন্ডি থেকে বেরিয়ে বাস্তব জগতের ভিতরে প্রবেশ করলেন। ১৯১১ সালে 'জনগনমন - অধিনায়ক' গানটি কলকাতা কংগ্রেসে গাওয়া হয়, পরে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। কবি চিরকাল গুণীকে সম্মান বা সমাদর করতেন, সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক। কিন্তু তিনি তাঁর দেশের একদল লোকের কাছ থেকে চিরকাল সমালোচিত হয়েছিলেন। এরপর কবি সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সত্যকে প্রত্যক্ষ করার মানসিকতা নিয়ে তীর্থযাত্রীর মত য়ুরোপ যাত্রা করলেন। য়ুরোপ থেকে আমেরিকা গেলেন। ১৫ নভেম্বর, ১৯১৩ - তে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি রবীন্দ্র- ঐতিহ্যকে বিশ্বময় করে তুলল।

১৯১৪ এর মে মাসে প্রকাশিত হল 'সবুজপত্র', সম্পাদক হলেন প্রমথ চৌধুরী। পরে ইনি 'বীরবল' নামে পরিচিত হন। চিত্র-বিজ্ঞাপন-বিবর্জিত সম্পূর্ণ নিরাভরণ অব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে প্রকাশ পেল 'সবুজপত্র'। মুখবন্ধে প্রমথ চৌধুরী লিখলেন ঃ ' স্বদেশের কিংবা স্বজাতির কোনও একটি অভাব পূরণ করা, কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্মও নয়; সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা ............আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র-মন্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তা হলে আমরা বাঙালী জাতির সবচেয়ে বড় অভাব তা কতকটা দূর করতে পারব। ...... আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য ব'লে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে, আলস্যকে ঔদাস্য ব'লে ..... উপবাসকে উৎসব ব'লে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় ব'লে, প্রমাণ করতে চাই। এর কারণ স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না — কিন্তু আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে। বাঙলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন।' [২৮]

রবীন্দ্রনাথ চিরযুবা, চিরনবীন। তিনি হলেন সবুজ সংসদের গুরু। নব নব সৃষ্টির সুরে ছন্দিত হল 'সবুজপত্রে'র বুক। কি ভাষায়, কি ভাবনায়, কি উপস্থাপনায় এক নব দিগন্তের দ্বার খুলে দিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনপথের পথিক। ..... তিনি লিখলেন ঃ ' চলিতে গেলেই দেখি সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয়, খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বর-দত্ত পাখাদুটাকে অসাড় করিয়া দিল; নয় বলিতে হয়, ঈশ্বর-দত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন; আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন। অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাসাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন



রবীন্দ্রনাথ—

ঠান্ডা থাকে।'

এতদিন আমাদের সমাজ দুরন্ত বা তারুণ্যকে নানা প্রকার শাসনে ঠান্ডা করে রেখেছিল। কতগুলি মানুষ যারা 'সমাজের মানুষগুলোকে লইয়া একান্ত পুতুল বাজির কারখানা খুলিয়াছে।' [২৯] রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী মন 'তারুণ্যের জয় হউক' ধ্বনিতে তাদের আর নির্বাসিত করে রাখা যাবে না বলে ঘোষণা করল। ৫৩ বছর বয়সেও চিরনবীন রবীন্দ্রনাথ এই বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে লিখলেন 'সবুজের অভিযান' (১৫ বৈশাখ, ১৩২১)ঃ

*'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা*
*ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ ,*
*আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।*
*রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে*
*আজকে যে যা বলে বলুক তোরে*
*সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে*
*পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা*
*আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।*

*খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;*
*আর তো কিছুই নড়ে নারে*
*ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।*
*ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,*
*চক্ষু - কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,*
*ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা*
*অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়*
*আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।'*

এই নবীন কিশোর ' চিরযুবা তুই যে চিরজীবী' বনোয়ারিলাল— সে দুরন্ত, সে জীবন্ত, সে অশান্ত, সে প্রচন্ড, সে প্রমত্ত, সে প্রমুক্ত, সে অমর পুরাতনের বেড়া ডিঙিয়ে অনিশ্চিত জীবনধারা ত্যাগ করে বিরামবিহীন অজানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল —আগুপিছু বিবেচনা করল না। অবিবেচনা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ

*'আন্ রে টেনে বাঁধা পথের শেষে।*
*বিবাগী কভু অবাধ পানে,*
*পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।*
*আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,*
*তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,*

*ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে*
*পথে চলার বিধিবিধান যাচা*
*আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।'*

'সবুজের অভিযান' রবীন্দ্র কাব্যে এক নতুন বাঁক — লক্ষ্যণীয় এর ছন্দরীতি। ১৯৩৬ সালে 'বলাকা' প্রকাশিত হল। য়ুরোপ থেকে ফিরে আসার পর ১৯১৪ সালে এই পর্যায়ের অনেক কবিতা রচিত হয়েছিল। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় মানুষের কবি হয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। 'বলাকা' রবীন্দ্রসাহিত্যে নব সূর্যোদয়। 'গীতাঞ্জলি'- পর্বে কবি যে পর্যায়ে পৌছেছিলেন সেই অতীন্দ্রিয় ভাবের পরিবেশ থেকে অন্য কারো পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। শেলীর *'Skylark' metaphysical abstraction — mystic* জগতে তার বিচরণ। অথচ *Wordsworth* - এর *Skylark* এর সম্পর্ক *Heaven and Home* এর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ সেই স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন এই মাটির পৃথিবীতে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই। সেজন্য আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনিই অগ্রগণ্য। 'বলাকা'- পর্বে এই প্রমুক্ত অবস্থায় কবি বন্ধু এন্ড্রুজকে লিখেছিলেন ঃ ' *I won't let you work during this vacation. We must have no particular plans for our holidays. Let us agree to waste them utterly, until laziness prones to be a burden to us ......... The cultivation of usefulness produces an enormous amount of failure, simply because in our avidity we sow seeds too closely.* ' ৩০

অথচ এই সময়েই কবি বিচিত্র কর্মের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। কর্ম যখন জীবনে উদগ্র হয় তখন মন থেকে কর্ম মুক্তির প্রার্থনা ওঠে। এরপর কবি সাংসারিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৪- এর মে মাসে কবি রামগড়ে যান। এই রামগড়ে রচিত হয় 'বলাকা'র তিনটি কবিতা ঃ 'সর্বনেশে', 'আহ্বান' ও 'শঙ্খ'। ' কবি বলিয়াছেন যে তখন তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলিতেছিল এবং পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হইতেছিল। .......'সর্বনেশে' কবিতা লিখবার অনেক পরে মহাযুদ্ধের তড়িৎবার্তা আসে। 'বলাকা' কাব্য লিখিবার পূর্বে কবি দীর্ঘকাল প্রায় সতের মাস বিদেশে ছিলেন,' অতএব তথাকার বিপুল জীবনযাত্রার আভাস তিনি মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন। তিনি অবলোকন করেছিলেন কি ভয়াবহ জীবনের সংঘাত পৃথিবী জুড়ে চলছে। এমন কি মহাযুদ্ধের পূর্বাভাসও কবিচিত্ত স্পর্শ করেছিল। উপরোক্ত ' কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি, পরে চার-পাঁচটি রামগড় থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সেসময় পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এন্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়ত এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে বলাকা বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতোনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা ক'রে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।' এরপর রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত বললেন ঃ 'আমি কিছুদিন থেকে এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের এই যুগ সমস্ত মানবের পক্ষে এক যুগসন্ধি, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসেনি। একটা ভাবীকাল আসছে যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে

ভিতরে ঘা দিচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময় এই চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল। ....... 'বলাকা'য় আমার এই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল।' তাই তো কবি লিখলেন ঃ

*'এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।*
*বেদনায় যে বান ডেকেছে*
*রোদনে যায় ভেসে গো।'*

রবীন্দ্র সাহিত্যে "গতিশীলতাই রবীন্দ্রনাথকে অনির্দিষ্টকাল অচলায়তনের সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ থাকতে দেয় নি।

১৯১০ সাল পর্যন্ত 'গীতাঞ্জলি' পর্বেরই আধিপত্য, তারপর ক্রমশঃ মিস্টিক কবির রূঢ় বাস্তবের ভূমিতে অবতরণ। সাধারণত মিস্টিক কবিদের ক্ষেত্রে এমন ঘটে না। হারিয়ে যেতে বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু হারিয়ে গেলেন না। ফিরে এলেন ক্রমশঃ। মোহাঞ্জন যে পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ, তা অবশ্য নয়।

কিন্তু 'বাতাস -আলো গেল মরে একী রে দুর্দৈব'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আভাস পেলেন কবি এই সময়ে,পাশ্চাত্য পরিক্রমার অভিজ্ঞতায়, শুরু হল 'বলাকা' -পর্ব। তীব্রভাবে অনুভব করলেন রবীন্দ্রনাথ ঃ ' হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনখানে'। কোথায় ? তা তখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু সময় বদলাচ্ছে। পৃথিবী, জীবনযাপন, সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনেরও সূত্রপাত অনুভব করছেন তিনি — 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা' এ সবের কি কোন মূল্য নেই? — 'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'    রাত্রির তপস্যা ব্যর্থ হয়নি।" [৩১]

বিশ্বযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে আন্তর্জাতিক চেতনা ও গভীরতা দান করেছিল, যা 'বলাকা' এবং পরবর্তী কাব্যধারায় প্রকাশিত।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ গতিতত্ত্বের বন্দনায় মেতে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম সকল পদার্থই গতিশীল। প্রকৃতির পাহাড়-পর্বত-অরণ্য, এমন কি মানুষের মন, তার কামনা-ভাবনাও গতিশীল। য়ুরোপের গতিবাদের জনক হেরাক্লিটাস খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে *the totality of things* - এর ধারণা দিয়ে বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড নিয়ত অপ্রতিহতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ-র মতও তাই। এ দুজনের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের মিল ছিল। বের্গসঁর মতে ঃ ' *There is no feeling no idea, no volition which is not undergoing change every moment. If a mental state ceased to vary, its duration would cease to flow......... The truth is that we change without ceasing and that the state itself is nothing but change*'. [৩২]

রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে সংসারের ধর্মই হচ্ছে চলা ঃ

*' আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের খালি-খালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে - বেরিয়ে*

*পড় প্রাণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।'*

এখানে প্রৌঢ় কবি পুনর্বার প্রমাণ দিলেন তর্কে নয়, বিরোধে নয়, সাহিত্যকর্মে তিনিই চির-আধুনিক। তিনিই সেই 'ফাল্গুনী'র জীবন সর্দার,নতুন যৌবনের দূত। সবুজপত্রে 'বলাকা' কাব্যের উদ্দাম তারুণ্যের কলরোল , 'ফাল্গুনী' নাটকে প্রমত্ত যৌবনের অভিযান — 'সবুজপত্রের' বুকে রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন এক রবীন্দ্রনাথ। পর পর প্রবন্ধ-ছোটগল্প-কবিতা-উপন্যাস লিখে গেলেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রান্তরে নব যুগ আনলেন। প্রকাশিত হল 'হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাই ফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা' প্রভৃতি গল্প, এছাড়া 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাস । সবচেয়ে বড় কথা, প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা ব্যবহার করে বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক নতুন মোড় আনলেন। পরে আমরা কল্লোল যুগের কথায় আসব।

রবীন্দ্র রচনাসম্ভারের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। সবুজপত্রের আগে এবং পরের পর্বে আমরা দুই রবীন্দ্রনাথকে দেখি— রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের ঐতিহ্য খারিজ করে বিদ্রোহী হয়েছেন। এ বিদ্রোহ পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং এই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ দুর্বার গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন । কবি মাত্রেই বিদ্রোহী, কবি মাত্রেই মননশীল। দেশের জড়তা স্থবিরতা গতিহীনতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহী মনোভাব। এর বিরুদ্ধেই তাঁর অস্ত্রধারণ। কবির অস্ত্র ছিল সাময়িক পত্রিকা— বিশেষ করে 'ভারতী' (১২৮৪-৯৮),'সাধনা' (১২৯৮ ১৩০২),'বঙ্গদর্শন' (১৩০৮-১৪),'আবার প্রবাসী' (১৩০৪-৮), এবং এখন থেকে 'সবুজপত্র' (১৩২১)।

'গীতোৎসার পালার শেষের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের মনে নিজের, স্বদেশের ও মানবসংসারের পক্ষে একটা আসন্ন বিরোধের ও বিদ্রোহের পূর্বচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। এই বিদ্রোহের একটা বিশেষ প্রকাশ হইল 'সবুজপত্র' উপলক্ষ্য করিয়া। কবির শিল্পতরু যেন পুরাতন পত্র ফেলিয়া দিয়া নবীন পত্রসম্ভার মেলিয়া ধরিল। রবীন্দ্রনাথ সর্বকালই পদে পদে নিজের সৃষ্টির মায়া কাটাইয়া চলিতেন। 'সবুজপত্র'- সমীরিত রচনায় যে নবীনত্ব ফুটিয়া উঠিল তাহা আরো অভাবিত। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতিতে কথ্য ভাষার বাচনপদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইলেন এবং পর্ব সৌষম্য উপেক্ষা করিয়া পদ্যরীতিতে গদ্যবন্ধের প্রসার আনিয়াছিলেন। এই ভাবে গদ্যে-পদ্যে বাংলা সাহিত্যের নূতনতর পালা শুরু হইল।' [৩৩]

১৯১৫ সালের ৯ নভেম্বর য়ুরোপ প্রান্তরে যে মহাযুদ্ধ চলছিল, তারই বেদনার মধ্যে কবিমনে জেগেছে এক অন্তহীন আশা ঃ

*'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা*
*এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।*
*স্বর্গ কি হবে না কেনা*
*নিদারুণ দুঃখরাতে*
*মৃত্যুঘাতে*
*মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা*

*তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?'*

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনভোর একটা বলয় গড়েছেন, পরে সেই বলয়ের মায়া ছেড়ে নতুনের পিছে ছুটেছেন বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে নব নব সৃষ্টির প্রেরণায়। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'আমি'কে আচ্ছন্ন না করে রেখে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেন। শুরু হল আমিত্ববোধের সুর ঃ

*'আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম,*
*শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম*
*আমায় তুমি ফুলে ফুলে*
*ফুটিয়ে তুলে*
*দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।*
*আমায় তুমি তারায় তারায় ছাড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।*
*আমায় তুমি মরণ মাঝে লুকিয়ে ফেলে*
*ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।*
*'আমি এলেম, কাঁদল তোমার বুম*
*আমি এলেম, এল তোমার দুখ,*
*আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,*
*জীবনমরণ- তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।*
*আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,*
*আমার মুখে চেয়ে*
*আমার পরশ পেয়ে*
*আপন পরশ পেলে।*

......................................................

*ওগো আমার প্রভু*
*জানি আমি তবু*
*আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল,*
*নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।'*

রবীন্দ্রনাথ কখনো আত্মসমর্পণ করেন নি। কবির এই মনোভাব থাকলে আমরা বিদ্রোহী নতুন রবীন্দ্রনাথকে পেতাম না। তাই কবি সব জড়তা কাটিয়ে লীলাচঞ্চল প্রাণের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন। ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজার ঘরে চলেছিলেন, কিন্তু ফুলসাজি ছেড়ে তাঁকে রণসজ্জা পরতে হল। পুরনো সব কিছুকে ভেঙে নতুন করে



রবীন্দ্রনাথ—

গড়ে তুলতে চাইলেন কাব্যসরস্বতীকে। ছন্দে-প্রকরণে এক নতুন জোয়ার এল। স্বয়ং বিধাতা যোদ্ধৃবেশে দেখা দিয়েছেন। সমস্ত অচলায়তনকে ভেঙে ফেলে রণসাজে সজ্জিত হয়েছেন ঃ

*'তোমার কাছে আরাম চেয়ে*
*পেলেম শুধু লজ্জা।*
*এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে*
*পরাও রণসজ্জা।*
*ব্যাঘাত আসুক নব নব*
*আঘাত খেয়ে অটল রব,*
*বক্ষে আমার দুঃখে তব*
*বাজবে জয়ডঙ্ক।*
*দেব সকল শক্তি, লব*
*অভয় তব শঙ্খ।'*

প্রাক্-বলাকা যুগে রবীন্দ্রনাথের মানব ভাবসত্যের অঙ্গীভূত ছিল। এ মানব হল শাশ্বত মানবতা। পরে এই পর্বে দেখি, সেই মানব 'মানুষে' রূপান্তরিত হয়েছে। খন্ড ক্ষুদ্র জীবনের আয়নায় কবি মানুষকে স্পষ্ট করে দেখলেন। যুগাযন্ত্রণায় কাতর বিপন্ন মানুষকে অভয় দিলেন কিভাবে উত্তরণে পৌছনো যায়। কবি এখানে শুধু চেতনার জগতে প্রবেশ করেননি, মানুষকে জানতে- বুঝতে, তার কষ্ট-দুঃখ নিবারণ করার জন্য অবচেতন বা মগ্ন চৈতন্যে প্রবেশ করেছেন। বিবর্তনের মাঝখান দিয়েই রবীন্দ্রসাহিত্যে পরিবর্তন এসেছে। আমিত্ববোধকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ফলে বিশ্বলীন জীবন থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। এতদিন যে আমি ছিল সঙ্কুচিত-প্রচ্ছন্ন, যা প্রাক্ -বলাকা কাব্যে প্রতিফলিত, পরবর্তী পর্যায়ে সেই আমি ফুলে -ফলে পল্লবিত ও মুকুলিত হয়ে উঠেছে। আধ্যাত্মিক চেতনার পাশাপাশি এসেছে-চেতনা।

*'যে-আমি ছায়ার আবরণে*
*লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে*
*সাধকের ইতিহাস তারি জ্যোতির্ময়*
*পাই পরিচয়।*
*যুগে যুগে কবির বাণীতে*
*সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে*
.......................................................
*সে মানব-মাঝে*
*নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,*

*সর্বত্রগামীরে।'* ৩৫

'পত্রপুট'-এ রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন' বলেছেন। দেশবিদেশের সীমানা পেরিয়ে যুগে যুগে যাঁরা পৃথিবীতে আলো নিয়ে মহাবাণী নিয়ে আবির্ভূত হন সেই সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক অমৃতের অধিকারীকে হাত জোড় করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

*'হে চিরকালের মানুষ; হে সকল মানুষের মানুষ,*
*পরিত্রাণ করো*
*ভেদচিহ্নের - তিলক-পরা*
*সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।'* ৩৬

আবার 'পরিশেষে' -এ সেই মানুষকে 'ব্যর্থ নমস্কারে' ফিরিয়ে দিয়েছেন। মানুষের ও দেশের সঙ্কট ও দুর্দিন দেখে বিচলিত কবি ক্ষোভের সঙ্গে 'প্রশ্ন' করেছেন ঃ

*'আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে*
*হেনেছে নিঃসহায়ে,*
*আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে*
*বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।*
.....................................................................
*যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,*
*তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।'* ৩৭

রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্যে অতীন্দ্রিয়-স্পন্দিত ভাব-ভাষা নিষ্প্রভ হলেও একেবারে লোপ পায়নি। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রকৃতি ও সৌন্দর্য উপলব্ধি এবং বিশ্বব্যাপ্ত মানবিক চেতনাই হচ্ছে রবীন্দ্রধর্ম, রবীন্দ্রদর্শন।

প্রাক্-বলাকা যুগে কবি লিখেছিলেন ঃ

*'ভজন পূজন সাধন আরাধনা*
*সমস্ত থাক্ পড়ে*
*রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে*
*কেন আছিস ওরে।............*
*তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে*
*করছে চাষা চাষ --*
*পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ*

খাটছে বারো মাস।

................................................

'মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি
মুক্তি কোথায় আছে।

................................................

'রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।' গীতাঞ্জলি/১১৯

কবি এখানে কর্মকেই ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের জয়গান ঃ

'মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোণে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল,
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে:
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের,
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী; ...এর মূঢ়;
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে ঃ জয় হোক মানুষের,' ৩৪

শেষ পর্যায়ে 'আরোগ্য' কাব্যে একই অনুরণন ঃ

'মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কল কল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে

*বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।*
*ওরা কাজ করে*
*নগরে প্রান্তরে।' (আরোগ্য কাব্য)*

মানব 'মানুষ' হয়েছে, রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রসারতা ঘটেছে। প্রাক-বলাকা যুগের আমিত্ববোধের স্ফুরণে রবীন্দ্রকাব্যে নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছিল, যার প্রেরণা জীবনানন্দের কাব্যে অনুভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির প্রভাব বুদ্ধদেব বসু এবং অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বিষ্ণু দে কেও আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্র-উপলব্ধিতে বিশ্ব-প্রকৃতির যে ছবি, তাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকেও অনুপ্রাণিত করেছিল।

রবীন্দ্রকাব্যকে মহিমান্বিত করেছে সমস্ত মানুষকে শুভবুদ্ধি দিয়ে সংযুক্ত করার ব্যাকুল আগ্রহ ও আর্তি। রবীন্দ্রনাথ কখনো এই বোধকে পরিত্যাগ করেন নি। বিশ্বমানবের কল্যাণচিন্তায় বারে বারে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন। তাই 'মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তাহলে মানুষ হলুম কেন?'$_{৩৮}$ — এই সুবিশাল বোধ দেশের সমস্ত ভৌগোলিক সীমা ছিন্ন করে অনুরণিত হতে লাগল। বিশ্বের আপামর মানুষের মুক্তির চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিভোর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে এল যুদ্ধের করাল ছায়া। পরিণামে মানুষ হল গৃহহারা, স্বজনহারা। খাদ্যাভাবে, বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে কত শত মানুষ প্রাণ দিল। ব্যবসা বাণিজ্য অচল হল। তবু এই মহাযুদ্ধেরই সর্বপ্রধান ও যুগান্তকারী অবদান ঃ পৃথিবীতে এক মহাযুগের সূচনা। কার্ল মার্কসের জীবনদর্শন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের বাস্তব প্রয়োগ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঘটল লেনিন ও বলশেভিকদের নেতৃত্বে রাশিয়ায় (১৯১৭, নভেম্বর)। 'ফরাসী বিপ্লব একদিন পৃথিবীর দেশে দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছে। রাশিয়ার 'নভেম্বর-বিপ্লব' পৃথিবীতে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়াইয়া দেয়। কিন্তু প্যাসিফিস্ট বা শান্তিবাদীদের হইতে ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। ইহাদের মূল বক্তব্য, পৃথিবীর কিছু ভালো ভালো লোক মিলিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধবিরোধী প্রচার ও বিবৃতি দিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারেন না। ইহা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ;— পৃথিবীর বাজার ও উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে লুঠ ও ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার জন্য বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রায়ই ওই ধরনের মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইবে, যতদিন তাহার মূল কারণ পুঁজিবাদের উৎখাত না হয়।'

লেনিনই প্রথম যুদ্ধ বন্ধ করবার আহ্বান জানালেন এবং একই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ না হলে যুদ্ধের শেষ হবে না।

*'The slogan 'Down with the war'! is, of course, a correct one ...... "The war cannot be ended 'at will — the war cannot be ended by an 'agreement' — It is impossible to escape from from the imperialist war at a bound. It is impossible to achieve a democratic, non-*



*রবীন্দ্রনাথ—*

*oppressive peace without the overthrow of this power of capital and the transfer of state power to another class, the proletariat.'* ৩৯

'অতএব পৃথিবীতে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণে বলশেভিক কমিউনিস্ট সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই শুরু হল বিবেকী ও সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী মানুষের অগ্নিপরীক্ষা। রমাঁ রোলাঁ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ মনীষী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করলেন। 'লীগ্ অব নেশনস' স্থাপিত হল। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলন শুরু হল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জ্ঞানবিজ্ঞান ও যন্ত্রযুগ বিস্তার লাভ করল।' ৪০

এই যুদ্ধ আমাদের ভারতবর্ষকে এক মহা সঙ্কটের আর্বতে ফেলেছিল। মন্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পনা, রাওলাট আইন, 'কারাগাতামারু' জাহাজে ইংরেজদের দলন নীতি, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, খিলাফৎ আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনা দেশে উত্তেজনার আগুন ছড়াল। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম ছাড়াও যুদ্ধোত্তর ভারতে দেশবাসীর স্বাধীনতাস্পৃহা বাড়ল, প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিল। পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, স্বল্প মজুরী, ছাঁটাই প্রভৃতি কারণে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ল, দেশ হল টালমাটাল। এই দেশব্যাপী উত্তাল পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে লক্ষ্য করেছেন। ১৯১৯ সালে 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরীকে পর পর পাঁচটা চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ, যা 'বাতায়নিকের পত্র' নামে অভিহিত। তাতে ফুটে উঠেছে ভারত তথা বিশ্ব-পরিস্থিতির উপর রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়া।

রবীন্দ্রনাথ কখনই নিরাপদ আরাম-আলস্য-বিলাস কিংবা কোন নন্দনতত্ত্বের গজদন্তমিনারের চূড়ায় বসে কাব্যরস বিতরণ করেন নি। জগতের অন্যায়-অবিচার-শোষণের বিরুদ্ধে এবং নিপীড়িত - লাঞ্ছিত মানুষের জন্য তিনি আজীবন কলম ধরেছিলেন। রমাঁ রোলাঁ, বারবুস এবং গোর্কির সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর তুলনা চলে। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তর্বিরোধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। আধুনিক রাজনীতি সদাচার, ন্যায়াচরণ ও ধর্মাধর্মবোধকে প্রতি মুহূর্তে যেভাবে পদদলিত করছে কিংবা 'মডারেট রাজনীতি'-র ইংরাজ তোষণের মধ্যে যে ক্ষুদ্রতা-নীচতা-হীনতা এবং দৈন্যের প্রকাশ ঘটছিল তা কোনদিনই রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেননি। ৪১ তাছাড়া *insurrection, violence, strategy, tactics, diplomacy* প্রভৃতি রুক্ষ স্থূল *crude* দিকগুলোকে ও সংবেদনশীল মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ কোন দিন মানিয়ে নিতে পারেন নি। তাই রবীন্দ্রনাথের নাইট পদবী ত্যাগ *' an adequate protest against what was happening at that time in the Punjab.'* ৪২

এই পর্যায়ে আরেকটা বিষয়ের কথা বলে রাখা ভালো যে, বিদেশে এবং আমাদের দেশে এই সময় জড়ভরত স্থবির পরিস্থিতিতে জঙ্গমতার ভাব এল। সমাজে নারীরা মাথা তুলে দাঁড়াল। বিভিন্ন গণ-সংগঠনে মেয়েরা যোগ দিল, তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হল। 'জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে, বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে বা শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলনের মধ্যে নারীরা অনেকেই যোগ্য অংশ গ্রহণ করেছেন।' ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক ধরে চলছিল রবীন্দ্র যুগ। ৪৩

রবীন্দ্রকাব্যে সমাজ-চেতনার এবং ব্যক্তি অভিজ্ঞতার প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে নানা টানাপোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাত ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রচিত্ত দ্বন্দ্বমুখর হয়েছে এবং নব নব ভাবনায় উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর লেখনী। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিবেশ ছিল শিক্ষা সঙ্গীত সাহিত্য সুকুমার কলা নাটক



রবীন্দ্রনাথ—

সংস্কৃতি চর্চার একান্ত অনুকূল। ফলে বিদেশী লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রচুর অবকাশ তিনি পেয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের য়ুরোপীয় চিন্তা, দর্শন ও সাহিত্য- ভাবনার প্রতিফলন রবীন্দ্রসাহিত্যে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-উক্তিতেই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ

আধুনিক 'বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। ........ বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবর্তন যে এত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার কারণ সেই সাহিত্যের আদর্শ হঠাৎ বাঙালির মনকে বাঁধা গন্ডি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৌতূহলী প্রাণশক্তি আছে যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে উদ্যত। সে চিরাগত প্রথার বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উদ্বেল হয়ে চলেছে। এই প্রাণশক্তির জিয়নকাঠি একদিন সমূদ্র পার হয়ে বাংলা ভাষাকে স্পর্শ করল।' [৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জন্ম-রোম্যান্টিক। তিনি ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, বায়রন, শেলি, কীটস, টেনিশন প্রমুখ রোম্যান্টিক কবিদের ভক্ত। এই রোম্যান্টিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল য়ুরোপে, রবীন্দ্র জন্মের প্রায় এক শতাব্দী আগে। তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গঙ্গা-যমুনার মিলনধারা প্রবাহিত ছিল। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে য়ুনিভারসিটি কলেজে পড়েছেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যের নানা গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। 'বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য .....আমাদের দেশে ইহা পড়িয়া পাওয়া জিনিস। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্য ব্যবহার করি নাই। আমরা ইহাকে শুধুমাত্র একটা মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনা রূপেই ব্যবহার করিয়াছি। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল।' [৪৫] তাই য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা আত্মিক অন্তরঙ্গতা জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত ছিল।

'এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় অমিয় চক্রবর্তী। তিনি বিলাত হইতে আধুনিক বই প্রায়ই পাঠান।' [৪৬] *Arthur Symons* - এর *'The Symbolist Movement in Literature'* ফরাসী বিপ্লবোত্তর চিন্তাশীল লেখকদের মনে একটা আমূল পরিবর্তন এনেছিল। এর কেন্দ্রমূলে ছিলেন *Charles Baudelaire*, তিনি কবিতার বাক্যে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটালেন '...... *He (Baudelaire) revolutioned the manner of thinking, writing and feeling in Europe ...........His aesthetic doctrine marks a date of paramount importance not only in the history of poetry, but also in art in general. It was in him that the symbolist movement in every country found its source.'* [৪৭] এর পর আর্থার র‍্যাঁবো (১৮৫৪-১৮৯১), পল ভার্লেন (১৮৪৪-১৮৯৬), স্টিফেন মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) প্রমুখ প্রতীকবাদ তত্ত্বকে সার্থকভাবে নিজেদের কাব্যে প্রয়োগ করেছিলেন। *Mallarme*-এর মতে ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্যই ভাষার সৃষ্টি, কিন্তু কাব্যকলার ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষমতা রাখবে ঃ *'It is the perfect use of this mystery which constitutes symbol.'* [৪৮]

রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে কার্ল মার্কস, মিল, বেন্থাম, বেবিংটন, মেকলে, ডারউইন, স্পেন্সার, হাক্সলি, কার্লাইল, ডিকেন্স, ডিসরেলী, রাসকিন , ওয়ার্ডওয়ার্থ, শেলি, কোলরীজ, কীটস, টেনিসন, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতির

রচনা পড়েছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে সারা পৃথিবীর বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের সাহিত্য ও কাব্য সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। পরবর্তী সময়ে অ্যান্টি-রোম্যান্টিক কবিদের সম্পর্কেও তিনি অবহিত হয়েছিলেন।

বাস্তবে সুন্দরের ধারণা রবীন্দ্রসৃষ্টিতে এক অনন্যসাধারণ রূপ পেয়েছিল। এই সত্যবোধের ভিত্তি জ্ঞান নয়, তা একান্ত তাঁর অন্তরের উপলব্ধি। সাহিত্যের চরম কথাই হল আনন্দ দান। 'সুন্দর আনন্দ, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার।' তাই রূপ ও অরূপ, খন্ড ও অখন্ড — এদের পরিপূর্ণ ঐক্য আমাদের মনে প্রতিফলিত হয়ে আনন্দ দান করে। রবীন্দ্র-রোম্যান্টিকতা য়ুরোপীয় রোম্যান্টিক কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি ব্যাপক। বিদেশী রোম্যান্টিক উৎকর্ষকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকরণ করেছিলেন এবং সর্বোপরি অপূর্বভাবে দুয়ের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। নিজেই নিজের *Symbol* সৃষ্টি করেছিলেন। এ জিনিস রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব। তাঁর গভীর ধর্মবিশ্বাস এবং বাল্যবয়স থেকেই তাঁর ব্যক্তিগত সাধনা তাঁকে তাঁর নিজস্ব পরিমন্ডল রচনায় সাহায্য করেছে। তাই তাঁর উদাত্ত ঘোষণা ঃ

*'আমারে বলে যে ওরা রোমান্টিক।*
*সে কথা মানিয়া লই*
*রসতীর্থ-পথের পথিক।*
*মোর উত্তরীয়*
*রঙ লাগায়েছি, প্রিয়ে।'*

..............................................

*'আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।*
*ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে*
*কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,'*

..............................................

*'যেথা ঐ বাস্তব জগৎ*
*সেখানে আনাগোনার পথ*
*আছে মোর চেনা।*
*সেথাকার দেনা*
*শোধ করি সে নহে কথায় তাহা জানি—*
*তাহার আহ্বান আমি-মানি।* [৪৯]

......................................................

*দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,*
*সেথায় রমণী দস্যুভীতা —*
*সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম;*
*সেথায় নির্মম কর্ম*

*সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ;*
*শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।'* ৪৯

রোম্যান্টিকতা কবিমনের অন্তঃস্থলে জারিত ও উত্থিত সম্পদ এবং মৌলিক চিত্রবৃত্তি। হৃদয় ও মনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। এই বোধ- ভাষা সৃষ্টিতেই কবি পারদর্শী।

*"A man has imagination in proportion as he can distinctly copy in idea the impressions of sense; it is the faculty which images within the mind the phenomena of sensation .....imagination in the power of depicting and fancy of evoking and combining. The imagination is formed by patient observation, the fancy by a voluntary activity in shifting the scenery of the mind. The more accurate the imagination, the more safely may a painter, or a poet, understake a delineation, or a description, without the presence of the objects to be characterized, the more versatile the fancy, the more original and striking will be the decoration produced.'* ৫০

প্রাচীন যুগে যেসব ক্লাসিক কবি মহাকাব্য রচনা করে 'মহাকবি' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন সেই বাল্মীকি, হোমাব, এমন কি কালিদাসও, লেখাকেই বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। যদিও তাঁদের কাব্যে ব্যক্তি অনুপস্থিত, শুধু সমাজ- সভ্যতা ও যুগের কথাই পরিবেশিত হয়েছে, তবু তার মধ্যেও তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। এখানে এঁরাও রোম্যান্টিক স্বভাবের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁরাও ছিলেন রোম্যান্টিক। তাঁদের সময়ে সমাজব্যবস্থা এবং কবি-কল্পনা দুয়েরই মিশ্রণে তাঁদের সৃষ্টি রূপ পেয়েছিল। সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নার মুক্তাপান্নার দ্যুতি বুকে নিয়ে মহাকাব্য অপূর্ব ভাষা ও ছন্দে রূপ পেয়েছিল—অতএব একে রোম্যান্টিকতা ছাড়া কি বলব?

পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখব যে আধুনিক কবিতা রোম্যান্টিক বিরোধী, কিন্তু বিশেষ কাব্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি কবিই কমবেশি রোম্যান্টিক। কবি কবি-কল্পনার *(Poetic imagination)* সাহায্যে পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বস্তুরাশির মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং তাকে ইঙ্গিতময় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলেন। বিভিন্ন কবি তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনা দিয়ে যে অনুভূতি প্রকাশ করেন তার মধ্যে ভাষার কারুকার্যতা আছে। সাধারণ কথ্য ভাষাকেও এমনভাবে ঘসে-মেজে তাঁরা উপস্থিত কবেন যার মধ্যে অপূর্ব সৃষ্টি ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

' ........ তারই নাম রোম্যান্টিকতা, যা ব্যক্তি বিশেষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার ক'রে নেয় শুধু ইস্ত্রি করা এটিকেট-মানা সামাজিক মানুষটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা কিছু গোপন ও পাপোমুখ ও অকথ্য, যা কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়— সেই বিশাল ও স্ববিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির



রবীন্দ্রনাথ—

নামই রোমান্টিকতা। এই শক্তি যা কোন কোন যুগে যেমন শেক্‌সপীয়রের ইংল্যান্ডে—যার বিস্ফোরণ গগনস্পর্শী হয়েছে, তা রুশোর পর থেকে সর্ব সাহিত্যের সাধারণ লক্ষ্মণ হ'য়ে উঠল। আরম্ভ হল ঐতিহাসিক রোমান্টিকতা, বিশ্বসাহিত্যের এক বিরাট ঘটনা যা মানুষের চিন্তার পরতে পরতে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে সমগ্র যুগ আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক; এলিয়ট অথবা ভালেরির মতো যাঁরা প্রকরণে বা মতবাদে ক্লাসিকধর্মী তাঁদেরও ভাষা ব্যবহার পরীক্ষা করলেই রোমান্টিক অন্যায় বেরিয়ে আসবে।' [৫১]

তবে একথা মনে রাখতে হবে, যুগের পর যুগ ধরে একই মনোভাব প্রকাশের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে যুগ পরিবর্তনের তালে তালে মানুষের ভাব-ভাবনা -ভাষারও পরিবর্তন হয়। তাই যুগোপযোগী রোম্যান্টিকতার সন্ধানে আধুনিক কবিদের অন্বেষণ।

কবির স্বভাবও মানসিকতা চিরদিনই বিদ্রোহী, চিরদিনই মননশীল। পুরনোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ভূমিকা নিয়ে নবীনের জয়যাত্রা সূচিত হয়। তাই কবিকে জড়তা, হীনতা, ক্লীবতা ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গুরু-র ভূমিকায়, আর আধুনিক কবিগোষ্ঠীর কবিরা হলেন তাঁর মানসশিষ্য। এই শিষ্যরা সবাই সমান ছিলেন না। কেউ কেউ গুরুরা সমালোচনায় মুখর হলেন। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

তার আগে একটা কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠেছেন *'at the most conscious point of the age'*-এ, আর তাঁর আধুনিক শিষ্যদের সত্তা ও কবিমানস বেড়ে উঠেছে *'at the most crucial point of age.'* [৫২]- এ সবচেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ কোন ছুৎমার্গে বিশ্বাসী ছিলেন না। নবীনদের কাব্যে যাঁর যেটুকু গুণ, তার প্রশংসা করেছেন। আসল কথা, সূর্যসমান রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্যুতি সেই সময়ে অনেকেই অনুভবে সমর্থ হননি।

বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুকরণে যদি স্বীকরণ না থাকে ও যদি নতুন রূপসৃষ্টি না হয়, তাহলে সবই বিফল। একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ '— আমাদের বিদ্যাশিক্ষার মূল বই থেকে নয়,নোট বই থেকে। এই রকম ক'রে আরেক মনের মন যেটা চিবিয়ে আমাদের জন্যে অর্ধেক হজম ক'রে দেয় সেই খাদ্যেই আমাদের মনের বাড়বার বয়স কাটল। এমন সময় আমাদের ভাবতে বললে আমাদের রাগ হয় এবং ভেবে যেটা দাঁড়ায়, সেটা অজীর্ণতা। তুমি কিছুকাল যদি ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, ডসটিভ্‌স্কি, বার্নাড শ কোট কর তাহলে তার মূল্য যতই তুচ্ছ হোক তার কাটতি এবং খ্যাতি হবে প্রচুর।' [৫৩]

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই গতিবান, চিরকালই নতুনের পূজারী। নিজের কাব্যের সীমা নিজেই লঙ্ঘন করতে করতে 'লিপিকা' পেরিয়ে 'পুনশ্চ'-এর পাটাতনে পৌছলেন — ছন্দ পেল মুক্তি, ভাষা হয়ে উঠল কাব্যের কাছাকাছি আটপৌরে — অপরূপ পেলবতায় ভরপুর — নতুন নান্দনিক সুবাসে সুবাসিত। সাহিত্য গতিশীল। আমরা বাঙালীরা বিশেষ করে আবেগপ্রবণ জাতি। তাই বিদেশী কিছুর গন্ধ পেলে সেই গন্ধেই আমরা আত্মহারা হই, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই। কিন্তু আমরা তলিয়ে দেখি না কোথায় ফাঁকি, কোথায় মেকি। রবীন্দ্রনাথ নবীনদের সমালোচনায়

বিশ্বাস স্থাপন করতে না পেরে নিজেই ভাবলেন, সারা জীবন অপার সাধনা দিয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা মিথ্যা নয়, ফাঁকি নয়। 'সাহিত্যের রূপ'-এ বললেন ঃ ''আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে স্তব্ধ নয়। তার চলতি ধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা-নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায় কালই তা আবর্জনাকুন্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কাল্চারের লক্ষণ ব'লে মানি। চলতি স্রোতে যা কিছু সবশেষে আসে তারই যে সবচেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হয়ে যায় এবং ভাবীকালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুব রূপ পায়, এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে। এই জন্যে মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তিরোগ মূর্ছা আক্ষেপ দেখা যায়। কিন্তু দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার ক'রে নিই। মনে করি তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী যেহেতু এটা আধুনিক।'

তাই আধুনিক সাহিত্যে কোন চারিত্র্যগুণ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল আধুনিক কাব্যে অভিজ্ঞতার অভাব, অন্তঃসারশূন্য, ভঙ্গিসর্বস্ব। যেটুকু পরিলক্ষিত হয় তাতে হয় থাকে রবীন্দ্রছোঁওয়া, নয় য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে তা ধার করা। *' The great poet always borrows, but he always pays back with interest, and his production is something more than the sum of his borrowing. '* ৫৪

বিদেশী ধ্যানধারণা ভাবভাবনাগুলো স্বীকরণ করে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারলেই সাহিত্যে তার সার্থকতা। কবি বা লেখক যা ধার করেন তার অনেক বেশি দেন। কিন্তু রবীন্দ্র-বলয় থেকে আধুনিক কবিরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহান জীবনাদর্শ দিয়ে পলে পলে তিলে তিলে নীপে নীপে সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিরোধ-বিক্ষোভকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, আর আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর আশ্চর্য অপূর্ব সৃষ্টির জগৎ ঃ *'the more perfect the artist, the more completely seperate in him will be the man who suffers and the mind which creates; the more perfectly will the mind digest and transmute the passions which are its material'* ৫৫ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এ কথা খুব বেশি করে প্রযোজ্য। তিনিই মহত্তম কবি। দুঃখ কষ্ট অন্ধকার হতাশা তাঁর প্রকাশকে বা সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। তাঁর মানবতাবাদী শুভ বোধ কোন ক্ষেত্রে বিপথে চালিত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ যে গুণটি বাংলা সাহিত্যে এনেছিলেন, যার অনুশীলনে অদ্যাবধি কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন নি, সেটা হল ঃ *' refined delicacy. '* 'বঙ্গ-সাহিত্যের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের কবিশেখর'। ৫৬ তাই নেতা না হয়েও নেতা, দেবতা না হয়েও দেবতা হিসেবে লোক-চিত্তে আসন পাওয়া একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। শুধু তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ও কর্মসাধনায় এটা সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়ে উঠেছে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার গুণে। ঐ প্রতিভা আর অপার মহানুভবতা, এই দুয়ে মিলে তিনি দেশ ও দেশের হৃদয়াসনে বসেছেন । দেশবাসী আন্তরিকভাবে তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে পুজো করছে তাঁর ছবিকে প্রতি বছর

২৫শে বৈশাখ। রবীন্দ্রজীবন আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে মাড়িয়ে, কেমন করে দ্বিতীয় এক নতুন রবীন্দ্রনাথে পরিণত হলেন এবং কেমন করে আধুনিকদের মাঝে প্রথম আধুনিক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরলেন, আমি সেটাই বলতে চাইছি।

'সহিত শব্দ হইতে 'সাহিত্য' শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে 'সাহিত্য' শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে, মানুষের সহিত মানুষেব, অতীতের সহিত বর্তমানেব, দূরের সহিত নিকটের, নিতান্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন (সাহিত্য) ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।'

রবীন্দ্রনাথ যাকে *expression of personality* বা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি বলেছিলেন, সেই *personality*-র আবার দুটি রূপঃ এক, 'বড়ো আমি' — সবার উপরে অখন্ড স্রষ্টা সত্তা এবং দুই, 'ছোট আমি' । *Individual* সাধারণ মানুষ হিসেবে কবি বা শিল্পী ক্ষুদ্রতার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু কবি বা শিল্পী তিনিই যিনি জাগতিক তুচ্ছতার দ্বারা পীড়িত বা আক্রান্ত হন না। তাই প্রাত্যহিক জীবনে কবির যথার্থ পরিচয় খোঁজা বৃথাঃ 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচারিতে'। কারণ কবি যখন কিছু সৃষ্টি করেন, তখন ব্যক্তিজীবন থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটে। এক কথায়, কবি-কল্পনা তখন রসের সমুদ্রে সাঁতার কাটে। সেই মুহূর্তে কবি তাঁর ব্যক্তিসত্তা,কামনা-বাসনা ও মোহ থেকে নিজেকে আপনাআপনি মুক্ত করে দূরকে নিকট, অতীতকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের একের সঙ্গে অপরের ঐক্য সাধন করেন। সৃষ্টির প্রেরণার মধ্যে অন্তরের আনন্দকে কবি প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসৃষ্টি হল লীলাময়। এই লীলাময়তার দুটো দিকঃ (ক) সীমার দিকে রূপ- শব্দ -গন্ধ-স্পর্শের জগৎ, আর (খ) অসীমের দিকে রয়েছে রসের জগৎ। *Clive Bedl* - এর কথা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ *'For a moment we are shut off from the human intrests, our anticipations and memories are arrested, we are lifted above the stream of life. '* এই রূপই হচ্ছে *'significant form'*, আর এই রূপ সৃষ্টিই হচ্ছে —শিল্প বা কবিতা। এর প্রথম কথা ঃ বিষয় নির্বাচন , যদিও এটাই সব বা শেষ কথা নয়।

নতুন নতুন বিষয়ের উপর ভর করে যেসব শিল্পীরা কবিরা সাহিত্যকে বা কাব্যকে নব নব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করেছেন বা করছেন, উত্তরকালে প্রাক্-বলাকা যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সমর্থন করেন নি। কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'সাহিত্যের 'ওরিজিন্যালিটি' বিষয়ে নেই, আছে রূপে। অতএব জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবনা। এই বুড়ার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে অল্পবয়সে বিধবা ও অনুমৃতা করা উচিত হয় না।' 'ইনটেলেকচুয়াল' হওয়ার আত্যন্তিক তাগিদের ফলে যদি প্রাণের ছন্দকে পেরিয়ে যায় , তাহলে তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিন্ড।'

রোম্যান্টিক রবীন্দ্রমননে সাহিত্যের *Realistic* দিকটা আংশিক প্রকাশ পেয়েছে। একথা ঠিক রবীন্দ্রমনন, রবীন্দ্রধর্ম এবং রবীন্দ্রদর্শন সাহিত্যতত্ত্বের সীমা লঙ্ঘন করে নি। তিনি বলেছেন, 'প্রকাশই কবিত্ব'। জ্ঞানের কথা নয়,

ভাবের কথাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। জ্ঞানের কথা প্রমাণ করতে হয়, কিন্তু ভাবের কথা 'প্রকাশ' ও 'সঞ্চার' করে দিতে হয়। জ্ঞানের কথা একবার জানলেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ভাবের কথা চিরপুরাতন হলেও নিত্যনবায়মান। রবীন্দ্রনাথ তাই বস্তুপ্রিয়তা কোন দিন সমর্থন করেন নি। আধুনিক কবিদের বস্তুপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন ঃ' এদের 'বিয়ালিজম' হল পাক দেওয়া শনের দড়ি। কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দের 'মেঘদূত' এদের মন যোগায় না। এরা বিলেতি পাক-শালায় প্রস্তুত 'রিয়ালিটি'র কারি পাউডার আমাদের সাহিত্যের রন্ধনশালায় আমদানি করেছে ,..........।'

রবীন্দ্র-পরিমন্ডলে একটাই সুর ঃ সাহিত্য হচ্ছে অখন্ড অনুভূতির প্রকাশ, তাই সাহিত্যের বিচারও অখন্ডভাবে হওয়াই উচিত। এই বোধ থেকে কোনদিন তিনি সরে আসেন নি। সমকালের সামনে কোনদিনই আত্মনিবেদন করেন নি। সহজে খ্যাতির চূড়ায় তখুনি উঠতে পারতেন, সমকালের কবিদের কাছে বাহবা পেতেন, কিন্তু এই সস্তা প্রলোভনকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখানেই রবীন্দ্রনাথ অনন্য। মূলকরাজ আনন্দ যথার্থই স্মরণ করেছিলেন যে, রেনেসাঁস আন্দোলনে আমাদের আত্মসচেতন করে তোলাই রবীন্দ্রনাথের মহত্তম দান। 'উত্তরাধিকারের এত বিত্ত ও বৈভব সত্ত্বেও তিনি যে অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে ক্ষীয়মান লোকসংস্কৃতির শীর্ণ ধারার দিকে ছুটে গিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য আবেগ-অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মত তার বহিরঙ্গ রূপের কাছে আত্মবিক্রয় করেন নি— এখানেই তাঁর মহত্ত্ব।'

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'একটি বহুতন্ত্রী বীণা' নামে অভিহিত করেছিলেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আর বিরোধের মধ্যে যোগসাধনই হল ভারতের সাধনা। যাঁরা বহুতন্ত্রী বীণাকে জোর করে দীনহীন একতারায় পরিণত করে ফেলতে চান, তারা ধর্মভ্রষ্ট। এই বিশেষত্বকে রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

তাই এই ভাব, এই বোধ ফুটে উঠেছে ঃ

*'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,*
*চুনি উঠল রাঙা হয়ে।*
*আমি চোখ মেললুম আকাশে—*
*জ্বলে উঠল আলো*
*পূবে পশ্চিমে।*
*গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'—*
*সুন্দর হল সে।*
*তুমি বলবে একে তত্ত্বকথা — এ কবির বাণী নয়।*
*আমি বলব এ সত্য,*
*তাই এ কাব্য।*
*এ আমার অহংকার*

*অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।*
*মানুষের অহংকারের পটেই*
*বিশ্বকর্মার বিশ্ব শিল্প।'* [শ্যামলী কাব্য]

রবীন্দ্রনাথের এই আমিত্ববোধের উত্তরণ ঘটল 'বলাকা' - পর্বে। এই আমিত্ববোধ-এর সাহায্যে বিশ্বলীন জীবন থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠ জীবনে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। প্রাক্-বলাকা যুগের আমিত্ববোধ বলাকা-পর্ব থেকে মুকুলিত, পল্লবিত হয়েছে। এই সময় থেকে অধ্যাত্মচেতনার প্রাধান্য অস্পষ্ট হতে থাকল, বাস্তব সত্য প্রাধান্য পেতে শুরু করল। অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যে অবদমিত মগ্ন চৈতন্যের প্রকাশ নেই, কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ কবি জানতেন, মানুষকে জানতে -বুঝতে হলে শুধু চেতনার স্তরে প্রবেশ করলেই চলবে না, তার মনের অবচেতনের অন্তঃস্থলে পৌঁছতে হবে।

তারই প্রকাশ —

*'জড়ত্বে ছিলেন পরাভূত,*
*ছিলেন উপবাসী;*
*ছিল শিথিল শক্তি ধূলিশয়ান।*
*বুকে ভর দিয়ে বসেছিল*
*সমস্ত আকাশের সঙ্গহীনতা।*

*'চাই চাই' করে কেঁদে উঠেছিল প্রাণ,*
*প্রহরে প্রহরে নিশাচর পাখির মতো।*
*নানা নাম ধরেছিল ভিক্ষা,*
*অন্তরের অন্ধস্তরে শিকড় চালিয়েছিল*
*আঁকাবাঁকা অশুচি কান্নার—*

*সত্যহারা শূন্যতার গর্ত থেকে*
*কালো কামনার সাপের বংশ*
*বেরিয়ে এসে জড়িয়েছে কাঙালকে —'* [৫৭]

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বে আমিত্ববোধ আত্মলীন সৌন্দর্যের পৃথিবী পরিভ্রমণ সেরে বলাকা-যুগে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে অমঙ্গলবোধ। তবে তার শুভ আস্তিক্যবোধ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এভাবেই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকাব্যে পরিবর্তন এসেছে। ধারাবাহিকতায় কোন ফাটল ধরেনি, স্পষ্ট ঐক্যসূত্রে রবীন্দ্রকাব্য বাঁধা। রবীন্দ্র -

আধুনিকতা বলতে কি বোঝায়, সত্যিই তিনি আধুনিক পর্যায়ে পড়েন কিনা, এ প্রশ্ন যাঁরা করেছেন পরে তাঁরাই অনুশোচনার অনলে বিক্ষত হয়েছেন। এক সময়ে এই ঈর্ষা বিদ্রোহে পর্যবসিত হয়। বিরাট সূর্যকে কে ঈর্ষা করল, কে নস্যাৎ করতে উদ্যত হল, তাতে সূর্যের কি যায় আসে! 'ইহাকে বলে যার শিল যার নোড়া, তারই ভঙ্গি দাঁতের গোড়া'। ( সুরেশ সমাজপতি/সাহিত্য-১৩১৯) এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে একটা কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্র-আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। প্রেমের ক্ষেত্রে দেখি, দেহকে বাদ দিয়েও দেহের ইন্দ্রিয়ঘন যে অবয়ব তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অতুলনীয় ঃ

*'ছিল পড়ি এক ভিতে*
*নীলাম্বর বস্ত্রখানি, রাশীকৃত করি*
*তারি 'পরে মুখ রাখি রহিল পড়ি —*
*সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে*
*লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।'* ৫৮

শুধু একটা ছেড়ে-ফেলা শাড়ি — দেহ অদৃশ্য, তবুও সেই দেহের সুবাস মাখানো এক ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশের আবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ । দেহের সুবাসে মনের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে অপূর্বভাবে।

আবার দেহের বর্ণনায় নিখুঁত রবীন্দ্রনাথকে দেখি ঃ

*'জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন কম্পন রাখিয়া*
*সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া*
*সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী —*
*স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।*
*অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল*
*লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল*
*বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে*
*পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র — ললাটে অধরে —*
*উরু'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়*
*বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়*
*ঝলকে ঝলকে।'*

এই কবিতার শুরুতেই দেখেছি ঃ

*তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীলবসন*
*লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত গৌরব*

*অনাদৃত শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ*
*এখনো জড়িত তাহে আয়ু পরিশেষ*
*মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ—*
*লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ*
*মৌন অপমানে। নূপুর রয়েছে পড়ি,*
*বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি*
*ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।'*

এখানে দেহ নেই, দেহের উত্তাপ, দেহের সৌরভ আভাসিত। পরিশেষে দেখি, এই দেহের সৌরভ উত্তাপ মিলিয়ে গেল ঃ

*'ছায়াখানি বক্ষপদতলে*
*চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া*
*অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া*
*ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি*
*উঠিল অনঙ্গদেব।*
*সম্মুখেতে আসি*
*থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে*
*চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে*
*ক্ষণকাল-তরে। পরক্ষণে ভূমি'পর*
*জানু পাতি বসি, নির্বাক্ বিস্ময়ভরে*
*নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার*
*সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপাচার*
*তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে*
*চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।'* ৫৯

যৌবনের প্রেমের দেবতা মদন জানু পেতে নতশিরে রমণীর পদপ্রান্তে পূজার উপাচারস্বরূপ পুষ্পধনু আর পুষ্পশরভার উজাড় করে দিল। দেখা যাচ্ছে দেহকে অঙ্গীকার করেও দেহকে অতিক্রম করে দেহাতীত পর্যায়ে পৌঁছনোই রবীন্দ্রকাব্যের প্রেমের লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য।

একেবারে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ 'স্থির বিশ্বাসে কম্পহীন দ্বিধাহীন' কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ঃ

*'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি -*

*অন্তরে নিয়েছি তুলি*
*এই মহামন্ত্রখানি,*
*চরিতার্থ জীবনের বাণী।'* ৬০

কম্বু কণ্ঠে বললেন ঃ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। দেখলেন 'ঐ মহামানব আসে' - দিকে দিকে তারই পদসঞ্চার। সভ্যতার সঙ্কট, কাটিয়ে একদিন মানুষের ঘরে ঘরে রণিত হবে শঙ্খধ্বনি। এ ব্যাপারে কিছু সমালোচক বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতাবাদীদের বিদ্রোহ বিক্ষোভ বা আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য নিজেকে আধুনিক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে দারুণভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। এই ধরনের ভাবনা সম্পূর্ণভাবে অপবাদমূলক এবং ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ রবীন্দ্র কাব্যভুবন, কাব্যভাবনা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটা ক্রম-বিবর্তনের ধারা বজায় রেখে এগিয়েছে—কোথাও পারম্পর্য ভাঙেনি বা নষ্ট হয়নি। ধারা থেকে ধারান্তরে অবলীলাক্রমে কবি বিচরণ করেছেন, অস্বাভাবিকতা ভাবার অবকাশ ঘটেনি। উপরন্তু সব সময়ে মনে হয়েছে যেন কবির সাধনার বিষয়টিও 'প্রকৃতির মতো নিখুঁত এবং অনিবার্য নিয়মের অমোঘ বিধানে বাঁধা।' 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে সোনার তরী-চিত্রা পর্যায়ে – চিত্রা থেকে ক্ষণিকা– ক্ষণিকা থেকে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি এবং এখান থেকে বলাকা- পূরবী পর্যায়ে – পূরবী থেকে মহুয়া-গদ্য কবিতায় প্রথম সচেতন পরীক্ষা লিপিকা — লিপিকার সম্ভাবনা পূর্ণতা পেল পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে। এই ' পুনশ্চ' কাব্যই রবীন্দ্রভাবনায় আধুনিকতার প্রথম পাটাতন। রবীন্দ্র উক্তিতে ধ্বনিত হল ঃ ' অসঙ্কুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূরে বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস' ৬১ এবং গদ্য ও পদ্যের ব্যবধানে বেড়া তোলার প্রতি কবি পক্ষপাতিত্ব দেখান নি। ব্যবধান বিলোপের পক্ষে এবং ব্যবধান ঘোচানোর পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঃ ' — যখন দেখি গদ্যে পদ্যের রস ও পদ্যে গদ্যের গাম্ভীর্যের সহজ আদান-প্রদান হচ্ছে তখন আমি আপত্তি করিনে।' ৬২

এই ভাবনায় জারিত বাচনভঙ্গির বর্ণনা ঃ

*'শান-বাঁধানো মেজে, খড়খড়ে-দেওয়া জানলা।*
*নীচে ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেল গাছ।'* ৬৩

রবীন্দ্রনাথের কারয়িত্রী প্রতিভা শৃঙ্খলের বেড়িতে বাঁধা বাংলা কাব্যমন্দিরের অর্গলকে খুলে দিল— বাংলা কাব্য পেল বৈচিত্র্য, পেল চারিত্র্য - স্বাতন্ত্র্য। এতদিন বন্ধ কাব্যমন্দির যে রোম্যান্টিক মায়ার মোহে বন্ধ ছিল, তা খোলা পেয়ে প্রকৃতির এবং বস্তুজগতের আলো-বাতাস পেল। 'কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় ............কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে।' ৬৪

'..........*দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল —*
*আনন্দ -অমৃত - রূপে বিশ্বের প্রকাশ'*

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী যখন গদ্যময়, ঠিক এই সন্ধিক্ষণে দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা কবির গগনচারী দৃষ্টিকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়েছে —রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে এই বোধ জাগ্রত হয়েছে ঃ



*রবীন্দ্রনাথ—*

*'আমার সুরের অপূর্ণতা।*
*আমার কবিতা, জানি আমি,*
*গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।'* ৬০

আস্তিক্যবোধে বিশ্বাসী ' অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ' অবলোকন করেও তাঁর বিশ্বাসবোধে সংশয় জাগেনি। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 'সব কলুষনাশন রুদ্রতা'র মাঝে নেমে আসবে 'মহাশান্তি মহাক্ষেম' । এভাবে রবীন্দ্রকাব্য ভুবন-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন নতুন ভাবে-ভাবনায়-প্রকরণে নিটোলতা বা অখন্ডতা পেয়েছে। রবীন্দ্র-চেতনায় আধুনিকতা বলতে 'বিশুদ্ধ আধুনিকতা' বোঝায়। কারণ বাস্তবের কুশ্রীতা, কদর্যতা 'পাঁকের মাতুনি' যে সাময়িক প্রাবল্যতা এনেছে তাতে সৌখিন চাতুরি ও মেকিত্ব ধরা পড়েছে ঃ 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতা কী, তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা' ৬৫ ফলে পুনশ্চ-পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে সুশ্রী সত্য সুন্দর শিবের পাশে কুশ্রতা-অসুন্দর- বীভৎসতা ভাব ও চিত্রভাষায় রূপ পেল।

বাঁশির নৈরাশ্যপীড়িত হরিপদ কেরানির সংসার/ লোহার গরাদে দেওয়া একতলা স্যাঁতা-পড়া ঘর। সেই ঘরেই —

*'আমি- ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব*
*এক ভাড়াতেই*
*সেটা টিকটিকি।'* ৬৭

কিংবা,

*' ছোটো ছোটো চোখে নেই রোঁওয়া, ....*
*যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা, ....*
*কপালটা মস্ত —*
*অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্প রচনার অবহেলা'* ৬৮

রবিকরোজ্জ্বল উদ্ভাসে ভাস্বরিত হয়েছে আধুনিকের দরজা। পরিশেষে এক আধুনিক কবির লেখনিতে ঃ

*'এখনো সময় আছে, এখনই তো মুক্ত অনায়াসে*
*মানুষের নামে সব স্বীকারোক্তি করার সময়।*
*ইতর সত্যের ভাষা লেখাটাই বড়ো কথা নয়*
*বরং মানুষ চেনো —*
*   *   *
*সে ছিল মাঠের রাজা অন্তহীন চাষের ফসল*

*এখন সাহিত্যে যারা সেই মাঠে করে চলাচল*
*তারা কেন ভাবে নাক' মাঠে আছে তাদেরও দখল'* [৬৯]

তাই আধুনিক কবিকুল অ্যান্টি-রোমান্টিক অভিধার টুপি পরলেও ভাবে-ভাবনা-ভাষায় প্রকরণে তাঁরা রোম্যান্টিক, যদিও রবীন্দ্র-রোম্যান্টিকতা থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক। তাঁরা কেবল রবীন্দ্র-রোম্যান্টিকতাকে টেনেটুনে বেঁকিয়ে চুরিয়ে বহু স্থানে ব্যবহার করেছেন।

জীবনানন্দ রূপসী বাংলাকে 'কস্তা পাড়' শাড়ি পরিয়েছেন, আর রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত সওদাগর অফিসের কেরানি হরিপদর স্বপ্ন-জগতের অধিবাসিনীর ছবি ঃ

*'যে আছে প্রতীক্ষা ক'রে তার*
*পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।'*

তাই তো –

*'আকবর বাদশার সঙ্গে—*
*হরিপদ কেরানির কোন ভেদ নেই'*

সমালোচক শেক্সপীয়র সম্পর্কে যে কথা বলেছেন ঃ *'he had a clearer and more comprehensive view of human problems than that of another writer of English and incomparable resources of language to express it.'* [৭০] --- সমভাবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমাদের দেশে আমাদের সাহিত্যে তা প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা প্রবন্ধে বিপিন চন্দ্র পাল বলেছেন ঃ 'উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তুসকল বাহির করিয়া আপনার অদ্ভুত কাব্যসকল রচনা করিয়াছেন।' তাই রবীন্দ্র সাহিত্য *' is so rich and various in special apprehensions of truth.'* রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব রশ্মি দিয়ে এই প্রকৃতি-মানবসংসার থেকে যা গ্রহণ করেছিলেন তার বহু তিনি বৃষ্টির জলধারার মতো ফিরিয়ে দিয়েছেন। [৭১] তুলনীয় ঃ *'The great poet always borrows, but he always pays back with interest, and his production more than the sum of his borrowing.'* [৭২]

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কিনা এ প্রশ্ন যাঁরা তুলেছিলেন, যাঁরা রবীন্দ্র-বিদ্রোহীরূপে ভূমিকা শুরু করেছিলেন, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত ঘোষণামত মুটে-মজুর-কামারের কবিতে উন্নীত না হতে পেয়ে আকাশ যেখানে নীল সেখানে উধাও হয়েছেন, হাতুড়ি-গাঁইতি-র কল্লোল সহ্য করতে না পেরে কেউ বা রামকৃষ্ণে সমাহিত হয়েছেন – এঁদের সঙ্গে তুলনীয় স্টিফেন স্পেন্ডারের *' God, That Failed.'* আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে



রবীন্দ্রনাথ—

তাই রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য কারণ তিনিই প্রথম আধুনিক, তাঁর পরে আর সবাই।

## ❒ উৎস প্রসঙ্গ ❒

(১-২) শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ)
(৩-৪) ধর্মপ্রচার / *ধর্ম*
(৫) ছোট ও বড় / *শান্তিনিকেতন*
(৬) বিশেষত্ব ও বিশ্ব/ *শান্তিনিকেতন*
(৭) শান্তিনিকেতন
(৮) মুক্তি / *শান্তিনিকেতন*
(৯) Process and Reality / *A.N. Whitehead*
(১০) পিতৃদেব / *জীবনস্মৃতি*
(১১) বসুন্ধরা / *সোনার তরী*
(১২) পত্রধারা / *ছিন্নপত্র*
(১৩) ভগ্নহৃদয়ে
(১৪) উৎসর্গ
(১৫) সীমার সার্থকতা / *পথের সঞ্চয়*
(১৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / *সুকুমার সেন*
(১৭) The Great Philosophies of the World / *C. E. MJoad*
(১৮) কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৩/২০
(১৯) শান্তিনিকেতন
(২০) গোরা
(২১) সীমার সার্থকতা
(২২) আত্মশক্তি ও সমূহ
(২৩) মনীষী রবীন্দ্রনাথ/ *যদুনাথ সরকার*
(২৪) দ্বারকানাথ ঠাকুর ঃ বিস্মৃত পথিকৃৎ/ *কৃষ্ণ কৃপালনী* (অনুঃ *ক্ষিতীশ রায়*)/ ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৪
(২৫) রবিজীবনী / *প্রশান্ত পাল*, পৃঃ৮১
(২৬) জীবনস্মৃতি (সূচনা)
(২৭) রবীন্দ্র জীবনী (২য়) / *প্রভাত মুখোপাধ্যায়*

(২৮) সবুজপত্র / *প্রমথ চৌধুরী*
(২৯) বিবেচনা ও অবিবেচনা
(৩০) Letters to a Friend, *P. 40*
(৩১) গণমুক্তির স্বপ্ন, তার বাস্তব রূপ এবং রবীন্দ্রনাথ / *ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ*
(৩২) Duration Creative Evolution / (**Translated by**) *A. Mitchell*
(৩৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / *সুকুমার সেন*
(৩৪) শিশুতীর্থ / *পুনশ্চ*
(৩৫) আমি / *পরিশেষ*
(৩৬) পত্রপুট / ১৪
(৩৭) প্রশ্ন / *পরিশেষ*
(৩৮) মানুষের ধর্ম
(৩৯) Selected Works, Vol . II / *V. I. Lenin*
(৪০) ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (২য়) / *নেপাল মজুমদার* (১৯৬৩), মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
(৪১) বাতায়নিকের পত্র
(৪২) Modern Review / February, 1926
(৪৩) রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী প্রগতি (প্রবন্ধ) / *কনক মুখোপাধ্যায়*
(৪৪) বাংলা কাব্য পরিচয় / *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*
(৪৫) জীবনস্মৃতি / *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*
(৪৬) রবীন্দ্র জীবনী (৪র্থ) / *প্রভাত মুখোপাধ্যায়*
(৪৭) Encyclopaedia Britanica, Vol. 3, Page 295
(৪৮) Mallarme - Selected Prose, Poems, Essays & Letters /*Bradford Cook*
(৪৯) রোম্যান্টিক (১৩৪৪)/ *নবজাতক*
(৫০) British Synonyms discriminated (1813) / *William Taylor*
(৫১) শার্লে বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা / বুদ্ধদেব বসু
(৫২) Practical Criticism /*I. A. Richards*
(৫৩) প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি
৫৪) A Key to Modern Poetry / *Lawrence Durrel*
(৫৫) Selected Prose / *T. S. Eliot*
(৫৬) মনীষী রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ) / *যদুনাথ সরকার*

(৫৭) কাল রাত্রে / *শ্যামলী*
(৫৮) পরিশোধ / *কথা*
(৫৯) বিজয়িনী / *কথা*
(৬০) আরোগ্য (১৯৪১)
(৬১) পুনশ্চ (ভূমিকা)
(৬২) সাহিত্যের স্বরূপ
(৬৩) বালক
(৬৪) রোগশয্যা (২৫)
(৬৫) জন্মদিনে
(৬৬) সাহিত্যের পথে, পৃঃ১১৫
(৬৭) বাঁশি / *পুনশ্চ*
(৬৮) সহযাত্রী
(৬৯) এবং রবীন্দ্রনাথ দুই বঙ্গে জন্মের প্রতীক / *অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়*
(৭০) Reading and Discrimination / *Denys Thompson*
(৭১) প্রমথ চৌধুরী
(৭২) A Key to Modern Poetry / *Lawrence Durrel*